হাটে
বাজারে

হাটে বাজারে

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

(বনফুল)

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
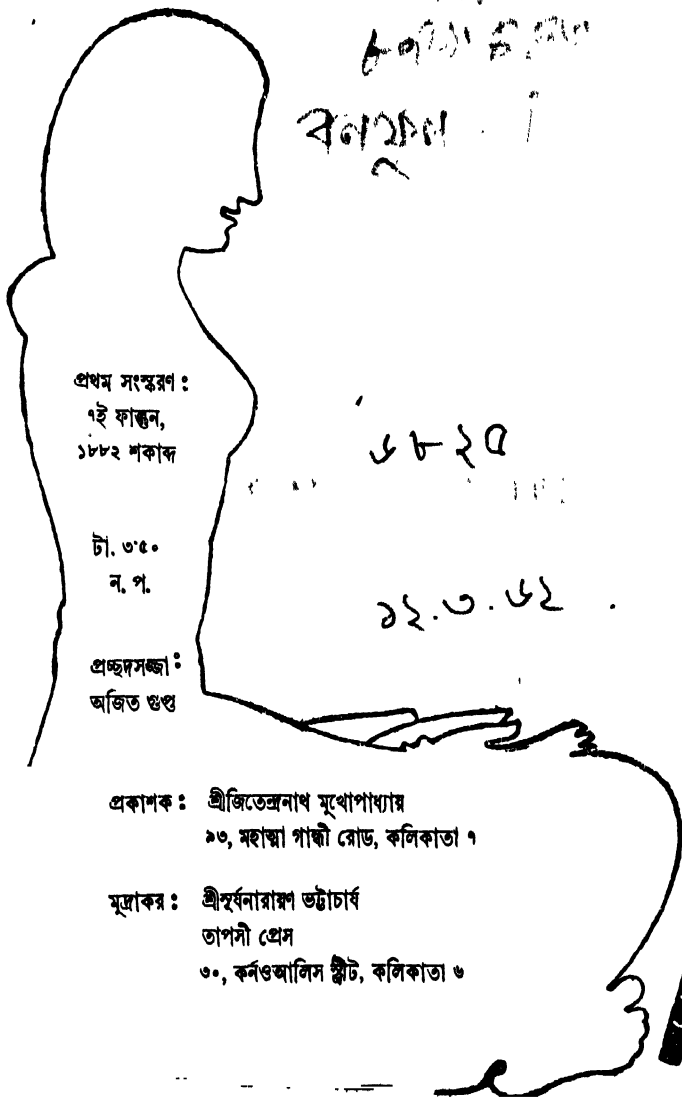
প্রথম সংস্করণ :
৭ই ফাল্গুন,
১৮৮২ শকাব্দ

টা. ৩·৫০
ন. প.

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

5.

ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য মাছের বাজারের সামনে তাঁর মোটরটি থামালেন। তারপর ড্রাইভার আলীর দিকে চেয়ে বললেন—গাড়ি বাঁয়ে দাবাকে রাখ্‌খো। আর টিফিন কেরিয়ার ঠো লেকে হামারী সাথ আও।"

"বহুত খু"—

বাঁ দিকের গলি দিয়ে মাছের বাজারে ঢুকলেন সদাশিব। গ্রীষ্মকাল। একটা বেজে গেছে। মাছের বাজার উঠে গেছে প্রায়। একটা বুড়ী মেছুনী কানা-উঁচু পরাতের মতো একটা টুকরিতে কিছু ভোলা মাছ নিয়ে বসে' আছে তখনও। মাছগুলোর পেট বেলুনের মতো ফোলা।

অসময়ে ডাক্তারবাবুকে বাজারে দেখে সে একটু শশব্যস্ত হ'য়ে উঠল। একটু আগেই তো ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, আবার এলেন কেন! আলী টিফিন কেরিয়ার নিয়ে পিছু পিছু আসছিল, সে নীরবে তার বাঁ হাতের তর্জনী এবং মধ্যমা সংযুক্ত করে' ঠোঁটের উপর রাখল, তারপর চোখের ভঙ্গী করে' জানিয়ে দিল—টুঁ শব্দটি কোরো না।

সদাশিব ভ্রূকুঞ্চিত করে' তাকে প্রশ্ন করলেন, "আবদুল কোথা—"

"আবদুল? গুদামে আছে বোধহয়। কিংবা হয়তো বাড়ি চলে' গেছে"

"আলী দেখ তো—"

"বহুত খু—"

আলী সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বন্‌বন্‌ করে' চলে' গেল গুদামের দিকে। আলীর ধরণ-ধারণ হাব-ভাব অনেকটা সার্কাসের

ক্লাউনের মতো। সদাশিব টিনের শেডের ছায়ায় আর একটু সরে' গেলেন। তারপর মেছুনীর দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলেন—"তোর নাতনী কেমন আছে—"

"ভাল আছে ডাক্তারবাবু"

"যে কটা ইন্‌জেকশন নিতে বলেছিলাম, নিয়েছে ?"

বুড়ী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে পায়ের পাতাটা চুলকোতে লাগল, যেন শুনতে পায় নি। কিন্তু সদাশিব ছাড়বার পাত্র নন।

"দশটা ইন্‌জেক্‌শন নিয়েছে ?"

"না। নেবার সময় পায় নি। তার স্বামী এসে তাকে নিয়ে গেল যে। কত মানা করলুম—"

গুম হ'য়ে রইলেন সদাশিব।

তারপর বললেন—"মজাটা পরে বুঝবে। পটাপট পেট থেকে যখন মরা ছেলে বেরুতে থাকবে তখন বুঝবেন বাবাজি—"

মেছুনীর নাতজামাইকেই বাবাজি বলে' উল্লেখ করলেন সদাশিব।

আবদুলকে নিয়ে আলী এসে হাজির হ'ল।

আলী আশঙ্কা করছিল বোমার মতো ফেটে পড়বেন ডাক্তারবাবু। কিন্তু তা তিনি পড়লেন না। আবদুলের দিকে চেয়ে শান্তকণ্ঠে বললেন—"টিফিন কেরিয়ারে তোমার জন্যে মাছ রান্না করে' এনেছি। খাও। আমার সামনে খাও—"

আবদুলের চক্ষু ছানাবড়া হ'য়ে গিয়েছিল। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে সদাশিবের দিকে।

"দেখছ কি, খাও—"

বুড়ী মেছুনী সভয়ে জিগ্যেস করল—"কি হয়েছে ডাক্তারবাবু ?"

"আবদুলকে জিগ্যেস কর। যে মাছ ও টাটকা বলে' একটু

আগে আমাকে বিক্রি করেছিল তা ও নিজেই খেয়ে দেখুক টাটকা কি না।”

“আমি বুঝতে পারি নি হুজুর। আমি ভেবেছিলাম ভাল করে’ বরফ দেওয়া আছে, খারাপ হবে না”

“হয়েছে কিনা খেয়ে দেখ নিজে—”

আলীর হাত থেকে টিফিন কেরিয়ারটা ছিনিয়ে নিলেন তিনি। তারপর যা করলেন তা অপ্রত্যাশিত। এক টুকরো মাছ বের করে’ গুঁজে দিলেন সেটা আবদুলের মুখে। তারপর টিফিন কেরিয়ারটা দড়াম করে’ ফেলে দিয়ে হনহন করে’ চলে’ গেলেন চাল-পট্টির দিকে।

চাল-পট্টির এক কোণে ডিম বিক্রি করে রহিম। কালো, বেঁটে, মুখে বসন্তর দাগ। ভুরু প্রায় নেই। তার পাশে বসে’ আছে তার মেয়ে ফুটফুটে ফুলিয়া। যদিও তার বয়স আট ন’বছর, কিন্তু বসে’ আছে যেন পাকা গিন্নীর মতো। রহিমের উপর নজর রাখবার জন্যে, তার মা তাকে বসিয়ে রেখে যায়। রহিমের একটু ‘আলু’ দোষ আছে। দবিরগঞ্জের রঙীন-কাপড়-পরা চোখে-কাজল-দেওয়া উন্নত-বক্ষা মেয়েগুলো যখন চাটের জন্য ডিম কিনতে আসে তখন আত্মহারা হ’য়ে পড়ে রহিম। তাদের বাঁকা চোখের চাউনি আর ঠোঁট-টেপা হাসিতে অভিভূত হ’য়ে দামই নিতে ভুলে যায় সে অনেক সময়। কেন ভুলে যায় তা জানে হানিফা, রহিমের স্ত্রী। তাই সে ফুলিয়াকে নিযুক্ত করেছে পাহারায়। ফুলিয়া সম্ভবতঃ নিগূঢ় সব খবর জানে না, তবে সে এইটুকু জানে যে তার বাপজান অন্যমনস্ক হ’য়ে অনেক সময় ন্যায্য পয়সা নিতে ভুলে যায়। অন্যমনস্কতাজনিত এ অন্যায় তাকেই সংশোধন করতে হবে—এ জ্ঞানটুকু টনটনে আছে তার।

সদাশিব রহিমকে বললেন—“আমাকে দু ডজন ভালো ডিম

দিয়ে আয় গাড়িতে। দেখিস যেন পচা না হয়। আবছুল আজ পচা মাছ দিয়েছিল, খেতে পারি নি। ফুলিয়া, তুই দেখিস তোর বাবা যেন না ঠকায়।"

একটা পাঁচটাকার নোট বার করে' দিলেন তিনি রহিমকে। ফুলিয়া মিষ্টি হাসি হেসে চাইল ডাক্তারবাবুর দিকে, তারপর ডিম বেছে বেছে জলে ডুবিয়ে দেখতে লাগল যে ডিমটা দিচ্ছে সেটা ভালো কিনা। সদাশিব সানন্দে লক্ষ্য করলেন ফুলিয়া কানে ছুটি ছোট ছোট মাকড়ি পরেছে। সোনার নয়, রূপোর। কিন্তু মানিয়েছে বেশ। কিছুদিন আগে ডাক্তার সদাশিবই তার কান বিঁধিয়ে দিয়েছিলেন।

"ডিমগুলো নিয়ে আয় গাড়িতে—"

চলে' গেলেন তিনি। অন্য কেউ হ'লে প্রত্যেকটি ডিম ভাল করে' দেখে দেখে নিত, কিন্তু সদাশিব দেখলেন না। কখনও দেখেন না, মাঝে মাঝে ঠকেন তবু দেখেন না। জনশ্রুতি ঘর-পোড়া গরু সিঁছুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। কিন্তু অনেকবার ঠকেও সদাশিব ভয় পান না, কারণ তিনি গরু নন, মানুষ। তাই তিনি মানুষকে বিশ্বাস করেন, বিশ্বাস করে' আনন্দ পান।

সদাশিব গাড়ির কাছে এসে দেখলেন আবছুল টিফিন কেরিয়ারটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সদাশিবের সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই চোখ নামিয়ে নিলে সে। সদাশিব থমকে দাঁড়ালেন, নিষ্পলক দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চেয়ে রইলেন তার মুখের দিকে, তারপর অপ্রত্যাশিত ভাবে অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে বললেন—"আজ কি হয়েছিল তোর! অমন পচা মাছটা আমাকে দিলি—"

"আমি বুঝতে পারি নি। তাছাড়া মাথারও ঠিক ছিল না—"

"মদ খেয়েছিলি না কি—"

"না হুজুর। রমজুটা জ্বরে বেহোঁস হ'য়ে গিয়েছিল। এখনও জ্বর ছাড়ে নি—"

"ওষুধ দাও নি কিছু ?"

"না এখনও দিই নি। ভেবেছিলাম এমনি সেরে যাবে—"

সদাশিবের চোখের দৃষ্টিতে আবার আগুন জ্বলে' উঠল।

"আমাকে বল নি কেন—"

আবদুল ক্ষণকাল চুপ করে' রইল।

তারপর বলল—"আপনাকে বারবার বিরক্ত করতে লজ্জা করে

সদাশিব কিছু বললেন না। গুম হ'য়ে জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন শুধু।

তারপর বললেন—"এখুনি আমি রমজুকে দেখতে যাব। গাড়িতে উঠে বোস—"

ঠিক এই সময় ফুলিয়া হাজির হ'ল ডিম আর বাকী পয়সা নিয়ে। আলী ডিমগুলো নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিল। সদাশিব পয়সাগুলো গুনে দেখলেন না। কেবল একটা এক-আনি তুলে দিয়ে দিলেন ফুলিয়াকে। ফুলিয়া একমুখ হেসে ছুটে চলে' গেল। স্মিত দৃষ্টি মেলে তার দিকে চেয়ে রইলেন সদাশিব। তাঁর মনে হ'ল নামটা সার্থক হয়েছে ওর। সত্যিই ফুলের মতো।

দুই

ডাক্তার সদাশিবের মতো লোক সাধারণতঃ দেখা যায় না। কোনো ভালো জিনিসই সাধারণের পর্যায়ে পড়ে না। হীরা-মুক্তা খোলামকুচির মতো পড়ে থাকে না পথেঘাটে। খনির অন্ধকারে

অথবা সমুদ্রের অতলে ওদের জন্ম হয় রহস্যময় উপায়ে। প্রচণ্ড চাপে কয়লা হীরকে পরিণত হয়, ঝিনুকের ভিতর সূক্ষ্ম বালুকণা প্রবেশ করে' সৃষ্টি করে মুক্তা। প্রচণ্ড চাপ অথবা বালুকণার প্রদাহ না থাকলে হীরা-মুক্তার জন্ম হ'ত না। সদাশিবের জীবনেও চাপ এবং প্রদাহ এসেছিল, কিন্তু সে তো অনেকের জীবনেই আসে, সবাই কি সদাশিব হয়? সদাশিবের সদাশিবত্ব হবার সম্ভাবনা নিগূঢ়ভাবে সুপ্ত ছিল তাঁর চরিত্রে, পরিবেশের প্রভাবে তা পরিস্ফুট হবার সুযোগ পেয়েছিল।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটা কারণ নিহিত থাকে পূর্বপুরুষদের জীবনধারায়। সদাশিবের পূর্বপুরুষদের সকলের খবর জানা নেই, কিন্তু সদাশিবের প্রপিতামহ সুরেশ্বর শর্মা একজন গৃহী সন্ন্যাসী ছিলেন একথা অনেকেই জানে। রবীন্দ্রনাথের একজন পূর্বপুরুষ যেমন 'ঠাকুর' নামে খ্যাত ছিলেন, তেমনি 'দেবতা' বলে' বিখ্যাত হয়েছিলেন সুরেশ্বর শর্মা। সবাই তাঁকে 'দেবতা' বলে' ডাকত। বৈষ্ণব সাধু হয়েছিলেন তিনি। তাঁর কয়েকটা বিশেষত্ব ছিল। তাঁর নিজের খাবারটা তিনি বিতরণ করে' দিতেন। নিজে সামান্য দুধ এবং ফল খেয়ে থাকতেন। সংসার থেকে তাঁকে যে খাবারটা দেওয়া হ'ত, সেটা তিনি পালা করে' এক একজন গরীবকে ডেকে খাওয়াতেন। আর স্বহস্তে সেবা করতেন সেই গাভীটিকে যার দুধ খেতেন তিনি। যে গাছগুলি তাঁকে ফল দিত তাদেরও সেবা করতেন। গাইটিকে নিয়ে বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা বাগানে বাস করতেন তিনি। সেইখানেই দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতেন সাধন ভজন করে'। কিছু জমি ছিল তাতেই সংসার চলে' যেত। উদরান্নের জন্য চাকরি বা ব্যবসা তাঁকে করতে হয় নি।

তাঁর ছেলে পীতাম্বরকে কিন্তু হয়েছিল। তিনিই প্রথম গ্রাম

ছেড়ে ক'লকাতায় যান একটা মার্চেন্ট আপিসের কেরানী হ'য়ে। প্রথমে দিনকতক একটা মেসে ছিলেন, তারপর বাগবাজারে গলির গলি তস্য গলির মধ্যে ছোট বাসা ভাড়া করেন একটা। সে বাসা আর তাঁরা ছাড়েন নি। পুরুষানুক্রমে সেই বাসাতেই বাস করছেন।

সদাশিবের জন্ম ওই বাসাতেই হয়েছিল। ক'লকাতা শহরেই বাল্য ও যৌবন কেটেছিল তাঁর। ওইখানেই তিনি স্কুল আর কলেজের পড়া শেষ করে' মেডিকেল কলেজে ঢোকেন। মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করার আগেই বিয়ে হয়েছিল সদাশিবের। যখন বিয়ে হয়েছিল তখন তাঁর বয়স বাইশ আর তাঁর স্ত্রী মনুর (মনোমোহিনী) বারো।

নববধূরা তখন পায়ে পাঁয়জোর নুপূর আর মল পরত। ঝুমঝুম করে' শব্দ হ'ত যখন ঘুরে ফিরে বেড়াত তারা। গুরুজনদের দেখলে ঘোমটা টেনে দিত। পায়ে আলতা পরত, গোল খোঁপার মাঝখানে পরত সোনার চিরুনি, খোঁপাকে ঘিরে থাকত বাহারে ফুল-তোলা কাঁটা। খোঁপার বিনুনিই ছিল কত রকম। মনুর এই ছবিটা এখনও মনে পড়ে সদাশিবের। পাঁয়জোর আর মলের ঝুমঝুম শব্দ এখনও শুনতে পান তিনি। বিশেষ করে' একটা ছবি তাঁর মনে অক্ষয় হ'য়ে আছে। মনু যখন রাত্রে শুতে আসত তখন তার মুখে অদ্ভুত একটা ভাব ফুটে উঠত। ঠিক সলজ্জ ভাব নয়, একটু লজ্জার আভাস থাকত অবশ্য, কিন্তু ভাবটা ঠিক সলজ্জ নয়, দুষ্টু দুষ্টু। মাথার ঘোমটা সরে' যেত তখন। উপরের দু'তিনটি দাঁত দিয়ে কামড়ে থাকত পানে-রাঙা নীচের ঠোঁটটি। ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত, চক্ষু আনত, আর সমস্ত মুখে চাপা হাসির আভাস। সদাশিব ডাকলে বাঁ হাতের ছোট্ট কিল তুলে দেখাত। এই ছবিটি অম্লান হ'য়ে আছে সদাশিবের মনে।

সদাশিব পাস করেই চাকরি পেয়েছিলেন। অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়েছিল তাঁকে। চাকরি-জীবনেরও অনেক টুকরো টুকরো স্মৃতি গাঁথা আছে তাঁর মনে। অনেক এবং বিচিত্র। সদাশিব রিটায়ার করেছিলেন বিহারেরই একটা শহরে। সেইখানেই বাড়ি কিনেছেন একটা। আশে-পাশে কিছু জমিজমাও। ব্যাঙ্কে টাকাও জমিয়েছেন। জমানো টাকার যা সুদ পান তাতেই সংসার চলে' যায় স্বচ্ছন্দে। সংসারে খাবার লোকও বিশেষ কেউ নেই। মনু যৌবনেই মারা গেছে। একটি মাত্র সন্তান হয়েছিল, মেয়ে। সোহাগিনী। সোহাগিনীর বিয়ে হ'য়ে গেছে অনেক দিন আগে। জামাই সুজিত বড়লোকের ছেলে, বড় চাকরিও করে। বছরে দু'বার তারা সদাশিবের কাছে আসে কেবল। প্রকাণ্ড বাড়িটায় সদাশিব থাকেন তাঁর ভাই-পো আর ভাই-পো বউকে নিয়ে।

ভাই-পো চিরঞ্জীব কোন কাজকর্ম করে না। সদাশিবের জমিজমার তদারক করে সে, তাঁর নানারকম ফাইফরমাশও খাটে। এককথায় চিরঞ্জীব সদাশিবের প্রাইভেট সেক্রেটারি। সদাশিবের বৈষয়িক ঝামেলা এবং চারিত্রিক খামখেয়ালের সমস্ত ঝঞ্ঝাট সে-ই পোয়ায়। চিরঞ্জীবের বউ মালতীও নিঃসন্তানা। ঘরকন্নার ভার তার উপর। চাকর দাই রাঁধুনী সব আছে, কিন্তু কর্ত্রী সেই। মালতী মোটাসোটা কালো রং। চোখ দুটি বড় বড়। শরীর বেশ আঁটসাঁট। ঈষৎ স্থূলাঙ্গিনী, কিন্তু বেশী মোটা নয়। বেশ রাশভারী। চিরঞ্জীব তো বটেই, সদাশিবও ভয় করেন তাকে। সদাশিব আর একটা কারণেও তাকে সমীহ করেন—সে রাঁধে ভালো। নিরামিষ আমিষ দুরকম রান্নাতেই সিদ্ধহস্ত। খাদ্যরসিক সদাশিব তার এ প্রতিভাকে খাতির না করে' পারেন না। রোজ একটা তরকারি নিজের হাতে করে সে। বাকী রান্না ঠাকুরকে দিয়ে করায়।

ঠাকুরকে দিয়ে করায় বটে, কিন্তু ঠাকুরের পিছনে সে দাঁড়িয়ে থাকে নিজে মহিষমর্দিনীর মতো, এক চুল এদিক ওদিক হবার উপায় থাকে না। মৈথিল ঠাকুর আজবলাল মালতীর তত্ত্বাবধানে থেকে প্রথম-শ্রেণীর রাঁধিয়ে হয়েছে। সে-ও মালতীকে ভয় করে খুব। মুখে যদিও বলে 'লছমী মাঈ', কিন্তু মনে মনে জানে ও একটি বাঘিনী। একটু বেচাল হলেই প্রচণ্ড ধমক দেয়।

আজবলাল সদাশিবের কাছে অনেকদিন আছে। মন্নুর আমল থেকে। আট টাকা মাইনেতে বাহাল হয়েছিল। এখন তার সঙ্গে আর মাইনের সম্পর্ক নেই, ঘরের লোক হ'য়ে গেছে, যখন যা দরকার হয় নেয়। বিকেলের দিকে একটু সিদ্ধি খায় সে। ওইটুকুই তার বিলাস। বেশ তরিবৎ করে' সিদ্ধির শরবৎটুকু খায়। সদাশিব আপত্তি করেন নি। সিদ্ধি খেয়ে আজবলালই বিপদে পড়ে মাঝে মাঝে। কোন কোন দিন তার মনে হয় সে মালতীর চেয়ে অনেক বড়, প্রায় তার বাপের বয়সী, তার মেয়ে জানকী বেঁচে থাকলে অত বড়ই তো হ'ত, সে কেন মালতীর ভয়ে গরুড়টি হ'য়ে থাকবে চিরকাল, মালতীরই বরং উচিত তাকে ভয় করা। মেয়েছেলের অমন খাণ্ডারনী হ য়া কি ভালো? তার উচিত মালতীকে বুঝিয়ে দেওয়া যে মেয়েমানুষের বেশী 'তেজী' হওয়া ঠিক নয়। সিদ্ধির ঝোঁকে এই ধারণার বশবর্তী হ'য়ে সে মালতীকে বোঝাতে যায় এবং বোঝাতে গিয়ে আরও বকুনি খায়। নিজেই শেষে সে বুঝতে পারে জল দিয়ে ধুয়ে লালজবাকে সাদাজবা করা যায় না।

কিছুদিন আগে সদাশিব যখন চাকরি থেকে অবসর নেন তখন তিনি অতীতের দিকে চেয়ে খোঁজবার চেষ্টা করেছিলেন জীবনে তাঁর

এমন কোন প্রকৃত বন্ধু বা আত্মীয় আছে কিনা যার কাছে গিয়ে তিনি বাকী জীবনটা আনন্দে কাটাতে পারেন। যন্ত্রের ইঞ্জিন তেল, কয়লা বা বিদ্যুতের সাহায্যে চলে। মানুষ-ইঞ্জিনেরও সেটা দরকার, কিন্তু তার আর একটা জিনিস চাই, ভালবাসা। কেবল টাকার জোরে সুখে থাকা যায় না। বেঁচে থাকবার প্রেরণা চাই একটা, সে প্রেরণার উৎস হওয়া চাই মহৎ কোন দার্শনিক জিজ্ঞাসা অথবা ভালবাসা।

সদাশিবের জীবনে কোন দার্শনিক জিজ্ঞাসার টানে জোয়ার আসে নি কখনও। তিনি সারাজীবন চাকরি করেছেন এবং ডাক্তারি করেছেন। নামকরা ডাক্তার ছিলেন অবশ্য, যেখানেই গেছেন তাঁর পসারের 'গর্জন' শুনেছে সবাই। কিন্তু নামকরা ডাক্তাররা ঠিক বৈজ্ঞানিক নন। তাঁরা অপর বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারকে প্রয়োগ করেন মাত্র। প্রয়োগ করে' পয়সা রোজগার করেন। তাঁরা অনেকটা কেরানীর মতো। আবিষ্কর্তা বৈজ্ঞানিক যে প্রেরণার আনন্দে বিভোর হ'য়ে থাকেন সে আনন্দ কখনও স্পর্শ করে না সাধারণ জেনারেল প্র্যাকটিশনার ডাক্তারের চিত্তকে। জেনারেল প্র্যাকটিশনারের একমাত্র লক্ষ্য জনপ্রিয় হওয়া এবং জনপ্রিয় হওয়ার উদ্দেশ্য উপার্জন। বৈজ্ঞানিকের লক্ষ্য সত্যের সন্ধান এবং প্রয়োজন হ'লে তার জন্যে দারিদ্র্য এবং অপমান বরণ করা।

এ প্রেরণা সদাশিবের জীবনে আসে নি কখনও। তিনি টাকা রোজগার করতেই চেয়েছিলেন এবং প্রচুর টাকা রোজগার করতে পেরেও ছিলেন। কিন্তু টাকা রোজগার করতে করতে জীবনের শেষের দিকে এসে হঠাৎ তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে—এসব কিসের জন্যে করছি? কার জন্যে? মনু তো চলে' গেছে অনেক দিন আগে, সোহাগেরও বিয়ে হ'য়ে গেছে—তবে? কিসের জন্যে এত

পরিশ্রম, এত দুশ্চিন্তা? অতীতের দিকে ফিরে তিনি অনুভব করলেন ভালবাসবার মতো আর কেউ বেঁচে নেই। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যারা বেঁচে আছে, তারা নামেই আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব। প্রেম নেই কারো মনে। আছে হিংসা, পরশ্রীকাতরতা আর তার উপর একটা প্রেমের ভান। ঝুটো প্রেমের মেকি অভিনয়ে মন আরও বিষিয়ে ওঠে।

যে অদ্ভুত জীবন ডাক্তার সদাশিব আজকাল যাপন করেন—হাটে বাজারে ঘুরে বেড়ানো—সে জীবন আরম্ভ করবার আগে যে জীবন তিনি যাপন করতেন তার কিছু আস্বাদ না পেলে বর্তমান জীবনের সম্যক অর্থ বোঝা যাবে না। সে জীবনের কিছু আভাস পাওয়া যায় তাঁর ডায়েরিতে। স্থান এবং তারিখের উল্লেখ না করে' তারই ঘটনাগুলি উদ্ধৃত করছি। ঘটনাগুলি একটানা ঘটে নি। মাঝে মাঝে সময়ের ব্যবধান আছে।

তিন

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়িতে গিয়েছিলাম তাঁর স্ত্রীকে দেখতে। আমি ভেবেছিলাম বাড়াবাড়ি কোনও অসুখ বুঝি। কিন্তু গিয়ে দেখলাম তিনি বেশ সেজেগুজে সোফায় ঠেস দিয়ে বসে' আছেন। বললেন সকালের দিকে তাঁর মাথাটা বড্ড ধরে। আর কানের ডগা দিয়ে আগুনের হলকা বের হয়। প্যালপিটেশনও আছে। শিরদাঁড়ার কাছটা শিরশির করে মাঝে মাঝে। সব বলবার পর হেসে বললেন, চিকিৎসার কোনও ত্রুটি করি নি। ক'লকাতার সব বড় বড় ডাক্তাররা দেখেছেন। ইলেক্ট্রোকার্ডিয়োগ্রাম, এক্সরে অপারেশন সব হ'য়ে গেছে। একজন বড় ডাক্তারের নাম করে' বললেন—তাঁরই

চিকিৎসায় আছি এখন। একগাদা রিপোর্ট আর প্রেস্কৃপ্‌সন্‌ বার করলেন আর সেগুলো এমনভাবে দেখাতে লাগলেন যেন গয়না দেখাচ্ছেন এবং দেখিয়ে গর্ব অনুভব করছেন।

আমার মনে হ'ল তিনি আমাকে চিকিৎসা করাবার জন্যে ডাকেন নি, তিনি যে বড় বড় ডাক্তার দেখাতে পারেন এবং হামেশাই দেখিয়ে থাকেন এইটে সাড়ম্বরে আমার কাছে আস্ফালন করবার জন্যেই আমাকে ডেকেছেন।

ভদ্রমহিলার সন্তান হয় নি। হবার সম্ভাবনাও নেই। বয়স ত্রিশের কোঠায় মনে হ'ল, যদিও আমাকে বললেন পঁচিশ। দেখলুম নানারকম কম্‌প্লেক্স্‌ জট-পাকানো রয়েছে মনে। অকারণে বাপের বাড়ির গল্প করলেন খানিক। তাঁর কোন্‌ ভাই কবে বিলেত গেছেন তা বললেন। তাঁর যে ভাই এস. পি. সে যে বিলেত থেকে মেম বিয়ে করে' ফিরেছে তা-ও কথায় কথায় জানিয়ে দিলেন। আমাকে অনুরোধ করলেন আমি যেন মাঝে মাঝে গিয়ে খবর নি তাঁর। বললেন—'একা এই জংগুলে দেশে পড়ে' আছি, একটা কথা বলবার লোক পর্যন্ত নেই। উনি তো সমস্ত দিন বাইরে বাইরে থাকেন। আয়া বেয়ারা আর চাপরাসী নিয়ে কতক্ষণ আর কাটানো যায় বলুন। বই-টই পড়ি। কিন্তু বই সব সময়ে ভালো লাগে না। আপনি দয়া করে' আসবেন মাঝে মাঝে। এই ইন্‌জেক্‌শনগুলো কি নেব?' একজন নামজাদা ডাক্তারের প্রেস্কৃপ্‌সন্‌, সুতরাং 'না' বলতে পারলুম না। বললাম, নিন। 'আপনি তাহলে দয়া করে' এসে দিয়ে যাবেন। যাবেন তো?' এবারও 'না' বলতে পারলাম না। যদিও বুঝলাম ও ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে তাঁর অসুখ সারবে না। অসুখ সারত একটি ছেলে হ'লে। কিন্তু হবে না, গত বছরই ইউটেরাসটি কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। টিউমার হয়েছিল নাকি। উনি নিজেও মনে

মনে জানেন যে ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে কিছু হবে না। আমাকে ডাকছেন আমার সঙ্গ কামনায়। আমাকে সামনে বসিয়ে বক্‌বক্‌ করে' বকে' যাবেন খালি, নিজের অন্তর্নিহিত নিদারুণ বেদনাটাকে চাপা দিয়ে বাহাদুরির ফুলঝুরি কেটে চেষ্টা করবেন নিজেকে এবং আমাকে ভোলাতে। আমাকে চাইছেন উনি ডাক্তার হিসেবে নয়, শ্রোতা হিসেবে। আমার চিকিৎসানৈপুণ্যে ওঁর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। একটা সাদা পট না থাকলে সিনেমার ছায়াছবি দেখানো যায় না। আমাকে উনি সেই সাদা পটের মতো ব্যবহার করতে চান।

মনুকে আজ খুব বকেছি। একটা তরকারি নুনে পোড়া, মাংসটা আলুনি। রাঁধুনী রয়েছে তবু বাহাদুরি করে' নিজে রাঁধতে যাওয়া চাই।...সমস্ত দিন মনু আজ কেঁদেছে। আসল কারণ অবশ্য ওর পিসেমশাই নিতাইবাবু। ভদ্রলোককে ইতিপূর্বে দেখি নি কখনও। উনি এসে থেকে আমাদের গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ। বারবার বলছেন কলিযুগে আমাদের মতো দম্পতি বিরল নাকি। হর-গৌরী আখ্যা দিয়েছেন আমাদের। মনু যখন রাঁধছিল তখন রান্নাঘরে গিয়েছিলেন তিনি। মনুকে রান্না শেখাচ্ছিলেন। মাংসে নুন না দেওয়াটাই বোধ হয় নূতনত্ব।

উনি কেন যে এসেছেন আমাদের কাছে আর কেনই বা আছেন এতদিন ধরে' তা বুঝতে পারি নি আগে। আজ বিকেলে বুঝতে পারলুম। ভেবেছিলুম মনুর প্রতি স্নেহবশতঃ এসেছেন বুঝি। কিন্তু দেখলাম তা নয়। পাওনাদারকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছেন। কালো কুচকুচে তাঁর পাওনাদারটি খুঁজে খুঁজে আজ এসে ধরেছিলেন তাঁকে। দুশমনের মতো চেহারা লোকটার। যদিও বাঙালী

কিন্তু কথাবার্তার ধরন থেকে মনে হ'ল কাবুলীর বেহদ্দ। প্রথমেই এসে 'শালা' সম্বোধন করলেন পিসেমশাইকে। তারপর গলায় গামছা দিয়ে টানাটানি করতে লাগলেন। এই নাটকীয় কাণ্ড ঘটতে লাগল আমার বৈঠকখানার বারান্দায়। বাধ্য হ'য়ে শেষে আমাকে বন্দুক বার করতে হ'ল।

পৃথিবীতে সবাই শক্তের ভক্ত, পাওনাদার মশাইও অবিলম্বে আমার ভক্ত হ'য়ে পড়লেন। শেষে বার করলেন তাঁর ন্যায্য পাওনার দলিলখানা। দেখলাম সুদে-আসলে তিনি পিসেমশায়ের কাছে পাঁচশ' টাকা পাবেন। আর একটা নাটকীয় কাণ্ড ঘটল। পিসেমশাই হঠাৎ আমার পা ধরে' হাউ হাউ করে' কাঁদতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, তুমি আমাকে এখন ওই কশাইটার হাত থেকে বাঁচাও বাবা, আমি ফিরে গিয়েই টাকাটা তোমাকে পাঠিয়ে দেব। বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখি মনু বিছানায় উপুড় হ'য়ে শুয়ে কাঁদছে। কিছুক্ষণ নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনুর এই নিদারুণ অপমানে আমিও যেন অপমানিত বোধ করতে লাগলাম। অনুভব করলাম টাকাটা দিয়ে দিতে হবে। ড্রয়ার থেকে টাকাটা বার করে' বাইরে গেলাম। পাওনাদারের হঠাৎ একটা অন্য চেহারা বেরিয়ে পড়ল। সে বলল—টাকাটা দিচ্ছেন দিন, আমার ভালোই হ'ল, কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলে' দিচ্ছি। নিতাইবাবুর কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না। ও আপনাকে টাকা দেবে বলছে কিন্তু দেবে না। ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। আমাকে আজ দু'বচ্ছর ধরে' ঘোরাচ্ছে। আপনি অন্ততঃ একটা হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিন ওর কাছে। তা না হ'লে টাকাটা মারা যাবে।

আমি জবাব দিলাম, সবাই তোমার মতো কশাই নয়। মুখে বললাম বটে, কিন্তু মনে মনে তারিফ করলাম লোকটার।

পিসেমশাই সেইদিন রাত্রেই উধাও হলেন। যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে কিম্বা মনুর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করে' গেলেন না। উনি চলে' যাবার পর মনু আর একটা কথা বললে। 'জান? উনি আমার বিয়ের সময় বাগড়া লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন? বেনামী চিঠি লিখে দু'এক জায়গায় বিয়ে ভেঙেও দিয়েছেন।' এরাই কি আমার আত্মীয়? আশ্চর্য!

বিধুবাবুর ছেলের টাইফয়েড হয়েছে। প্রথমতঃ প্রতিবেশী দ্বিতীয়তঃ গরীব মানুষ। ফি না নিয়েই চিকিৎসা করছিলাম। দুবেলা তো যেতামই, কোন কোন দিন তিনবারও গেছি। আজ সকালে গিয়ে দেখি একটি ফরসা ছোকরা বসে' আছে। বেশ ফিটফাট ছিমছাম। চোখে প্যাঁশনে, পরনে আদ্দি, পায়ে পেটেণ্ট লেদারের 'শু'। আমি ঘরে ঢুকতে বিধুবাবু উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু সেই ছোকরা দাঁড়াল না। বিধুবাবু বললেন, ইনিই আমাদের প্রতিবেশী ডাক্তার সদাশিববাবু। পটলার চিকিৎসা ইনিই করছেন। আমি ডাক্তার শুনে ছোকরা এমনভাবে আমার দিকে চাইলে যেন সে কোন অদ্ভুত জীব দেখছে। তারপর বাঁ হাতটা তুলে কপালে ঠেকিয়ে বললে—অ, আপনিই এর চিকিৎসা করছেন। বসুন বসুন আপনাকে অনেক কথা বলবার আছে। বিধুবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—ইনি কে? বিধুবাবু হাত কচলে উত্তর দিলেন—এ আমার ভাগ্নে বিলাস। মেডিকেল কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। ছুটিতে এখানে বেড়াতে এসেছে। পটলের প্রেস্ক্রিপসনের ও কিছু অদলবদল করতে চায়। ও বলছে আজকাল মেডিকেল কলেজে না কি···। থামিয়ে দিলুম বিধুবাবুকে। বললুম—আপনার ভাগ্নে এখনও ডাক্তার হন নি।

আমি অনেকদিন ধরে' ডাক্তারি করছি। মেডিকেল কলেজে আজকাল কি ধরনের চিকিৎসা হচ্ছে তা আমিও জানি। আপনার ভাগ্নের মারফত সেটা আমার জানবার দরকার নেই। বিধুবাবু একটু হকচকিয়ে গেলেন। বললেন, হ্যাঁ, তাতো বটেই। তবে ও কি বলছে সেটা একবার শুনলে হ'ত না? আমি উত্তর দিলাম, না, যে এখনও ডাক্তারি পাস করে নি তার সঙ্গে আমি চিকিৎসা-বিষয়ে কোন কথা বলব না। আপনারা ওকে দিয়েই চিকিৎসা করান, আমি চললুম।

বাঙালীর ভদ্রতাবোধ কি একেবারে চলে' গেছে? বিধুবাবু কেন আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনে হচ্ছে বাহাদুরি দেখাবার জন্যেই এটা করলেন উনি। উনি বোধহয় অজ্ঞাতসারেই আমার কাছে জাহির করতে চাইলেন—দেখ হে, আমিও নেহাত কেউ-কেটা নই। আমার ভাগ্নেও মেডিকেল কলেজে পড়ে, দু'দিন পরে তোমার মতোই ডাক্তার হবে। সত্যি, আমরা চাষা হ'য়ে গেছি। যে শিক্ষার প্রধান লক্ষণ বিনয় সেই শিক্ষা লোপ পেয়ে গেছে আমাদের ভিতর থেকে। ছি, ছি।

রঘুবাবু ছেলের বিয়ে দিলেন খুব ধুমধাম করে'। বড়লোক কুটুম হয়েছে। ক'লকাতা থেকে রাঁধুনী এসেছিল, কাশী থেকে সানাই। শহরের অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বেশীর ভাগই অফিসার। হাসপাতালের ডাক্তার হিসাবে আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। গিয়েছিলাম আমি। গিয়ে দেখলাম আয়োজনের কোনও ত্রুটি নেই। চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় সব রকম ব্যবস্থাই আছে। মদের ব্যবস্থাও ছিল। পরের পয়সায় মদ খাওয়ার সুযোগ যারা ছাড়ে

না, বাড়িতে যাদের জোলো চা ছাড়া অন্য কোন প্রকার পান-বিলাস নেই, তাদের অনেকেই দেখলাম দাঁত বার করে' গিয়ে আসর জমিয়েছে মদের টেবিলের ধারে আর উচ্চকণ্ঠে গুণগান করছে রঘুবাবুর কাল্‌চারের। রঘুবাবু নিজে দেখলাম ব্যস্ত আছেন বড় বড় অফিসারদের নিয়ে। কমিশনার সাহেব, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আর পুলিস সাহেব—এই তিনজন সাহেবকে বসিয়ে ছিলেন তিনি একটি বিশেষভাবে সজ্জিত টেবিলে এবং সেইখানেই সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে হেঁ—হেঁ করছিলেন। আমাদের কাছে একবারও আসেন নি। আমাদের অভ্যর্থনা করছিল তাঁর একজন মুহুরি।

ওভারশিয়ার স্থরথবাবুর চরিত্রের একটা দিক সহসা উদ্‌ঘাটিত হ'ল আজ আমার কাছে। তাঁকে সাধারণ ঘুষখোর ওভারশিয়ার বলেই জানতাম। কিন্তু তিনি যে মানব-চরিত্রের গহনেও সন্ধানী-আলো নিক্ষেপ করতে সক্ষম তা জানতাম না। এখানকার স্কুলের হেডমাস্টার গগন বসু প্রবীণ লোক, মাথার চুলে পাক ধরেছে। সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে।

স্থরথবাবু কিছুদিন আগে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁর বগলে একটা দাদ আছে, সেইটের জন্যে মাঝে মাঝে মলম নিতে আসেন আমার কাছে। কথায় কথায় সেদিন গগনবাবুর কথা উঠল। আমি বললাম, আপনাদের খুব ভাগ্য যে গগনবাবুর মতো পণ্ডিত চরিত্রবান লোক আপনাদের স্কুলের হেডমাস্টার। স্থরথবাবুর চোখে-মুখে একটা কুটিল হাসির চমক খেলে গেল। তারপর বললেন, ভাগ্যই বটে। বলে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। আমি একটু বিস্মিত হয়ে' জিজ্ঞাসা করলাম—অমন করে' হাসছেন

যে। সুরথবাবু একটু তুলে মাথা নেড়ে বললেন, হাসি পেল বলেই হাসছি। আপনারা সাদাসিধে মানুষ, সকলের ওপরটা দেখেই মুগ্ধ হ'য়ে যান। আমরা সব জানি কিনা তাই অত সহজে মুগ্ধ হ'তে পারি না। জিগ্যেস করলাম, কি জানেন? তিনি একটু মুচকি হেসে উত্তর দিলেন, সব কথা কি বলা যায়! বলেই রহস্যময় হাসি হাসতে হাসতে চলে' গেলেন।

আজ যোগেন এসেছিল। যোগেন আমার বাল্যবন্ধু। সে হেসে আমাকে বললে—'কি রে, তুই আজকাল ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস নাকি!' 'কি রকম?'—আকাশ থেকে পড়লাম আমি। তখন যোগেন বললে—সে ট্রেনে যে কামরায় ছিল সেই কামরায় সুরথবাবু নামে একজন ওভারশিয়ার ছিলেন। তিনি তাঁর ইয়ারবক্সিদের সঙ্গে গল্প করতে করতে যাচ্ছিলেন। একজন তোর প্রশংসা করাতে সুরথবাবু বললেন—'তোমরা ওপরটা দেখেই গদগদ হ'য়ে পড়। কিন্তু আমি পারি না, কারণ আমি ভিতরের অনেক খবর জানি যে। কিন্তু সে সব কথা বলে' আর লাভ কি। তবে এটা জেনে রাখ উনি ডুবে ডুবে জল খান।' আমি যে এতবড় একজন ডুবুরী তা আমার নিজেরই জানা ছিল না! দুনিয়ায় কত রকম মানুষই যে আছে!

বাড়িতে মহা হুলুস্থূল পড়ে' গেছে। অনেকদিন পরে আমার এক বোন আমার কাছে চেঞ্জে এসেছে। তার অসুখবিসুখ কিছু নেই। কিন্তু ক'লকাতার লোকেদের চেঞ্জে যাওয়া একটা বাতিক। বিশেষতঃ কোথাও বিনা-পয়সায় থাকবার খাওয়ার জায়গা যদি থাকে তাহলে তো কথাই নেই, কোন রকমে থার্ড ক্লাসের ভাড়াটা যোগাড় করে' ছুটবে সেখানে। আমার আপন বোন নয়, পিসতুতো বোন।

সে এসেছে বলে' আমি যে অসন্তুষ্ট হয়েছি তা নয়, কিন্তু সে আসাতে আমার ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে।

আমার বোনের ছেলেমেয়েগুলো ভারি অসভ্য। পাঁচটা ছেলে, পাঁচটাই বর্বর। এসেই আমার ঘরের দামী পরদাগুলো ধরে' ঝুলতে লাগল সবাই। একটা পর্দা ছিঁড়ে গেছে। ধমক দিলে শোনে না। আমার বোন ইনিয়ে বিনিয়ে তাদের মানা করে বটে কিন্তু ছেলেগুলো তার কথায় কর্ণপাত পর্যন্ত করে না। বোনের বকুনিটাও বকুনির মতো শোনায় না, মনে হয় মানা করতে হয় তাই করছে, কিন্তু কণ্ঠস্বরে ভর্ৎসনার সুরটা ঠিক ফুটছে না। বড় ছেলেটা এসেই আমার রেডিওটা খারাপ করে' দিয়েছে। এই মফঃস্বল শহরে সারানো মুশকিল। ক্রিকেট ম্যাচের খবর শুনতে পাচ্ছি না। মেজাজটা বিগড়ে গেছে। ফুলবাগানটাকে তছনছ করে' দিলে। পটাপট করে' ফুলগুলো তো তুলছেই, গাছের ডালও ভাঙছে। আমার স্প্যানিয়েল কুকুরটাকে তো অতিষ্ঠ করে' তুলেছে। কেউ তার কান টানছে, কেউ ল্যাজ, কেউ তার পিঠে চড়ে' ধামসাচ্ছে। ভালো জাতের ভালো কুকুর তাই কিছু বলে না, আভিজাত্য একটু কম থাকলে কামড়ে দিত। আমার শখের বাইনকুলারটা তাক থেকে পেড়ে নিয়ে কাড়াকাড়ি করে' দেখছে সবাই মিলে। তাদের ধরণ-ধারণ দেখে মনে হয় এসব যেন তাদের বার্থরাইট। মামার বাইন-কুলার নিয়ে দেখবে না তো কার বাইনকুলার নিয়ে দেখবে?

একজন ছুতোর মিস্ত্রী কিছুদিন আগে আমার রোগী হয়েছিল। তার স্ত্রীর কুষ্ঠের চিকিৎসা করেছিলাম, কিছু নিই নি। সে একটা ড্রেসিং টেবিল উপহার দিয়েছে আমাকে। চমৎকার একটি আয়না 'ফিট' করা আছে তাতে। আমার বোন সেটা দেখে বললে—দাদা, আমাকে ওটা দাও না। তোমার তো আর একটা রয়েছে। বললাম,

তুই একটা কিনে নিস আমি দাম দিয়ে দেব। এখান থেকে ওটা নিয়ে যেতে হ'লে ভেঙে যাবে, তাছাড়া একজনের দেওয়া উপহার, নিজের কাছেই রাখা উচিত।

বোনের মুখভাব দেখে বুঝলাম আমার কথায় সে সন্তুষ্ট হ'ল না। মনু তাকে অনেকগুলো শাড়ি দিয়েছে, কিন্তু দেখলাম মনুর বাতিকের শাড়িটার উপর তার লোভ খুব। মনুকে বলেছি ওটা দিয়ে দিতে, আমি আবার তাকে কিনে দেব। মনু মুখে বললে, আচ্ছা। কিন্তু তার গম্ভীর মুখ দেখে বুঝলুম সে মনে মনে পছন্দ করে নি প্রস্তাবটা।

কিন্তু মনু সবচেয়ে চটেছে আর একটা ব্যাপারে। আমার বোনের বড় ছেলে টুলটুল আমার মেয়ে সোহাগের গালে কামড়ে দিয়েছে। সোহাগের বয়স পাঁচ বৎসর, টুলটুলের দশ। আমার বোন জিগ্যেস করলে, ও কি রে, ওর গালে অমন করে' কামড়ে দিলি কেন? টুলটুল হেসে উত্তর দিলে—গালটা ঠিক টমাটোর মতো যে! আমি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না, হাণ্টার বার করে' খুব চাবকেছি ছেলেটাকে। ভেবেছিলাম লাঠ্যৌষধি পড়েছে এইবার, ঠিক হ'য়ে যাবে সব। কিন্তু হ'ল না। আজ সকালে চাকরগুলো হৈ হৈ করে' ওঠাতে বেরিয়ে দেখলাম আমার বোনের মেজ ছেলে একটা হাঁসের গলা টিপে ধরেছে। পাতিহাঁস। নিখুঁত সাদা রং বলে' কিনেছিলাম একজোড়া। তারই একটার গলা টিপে ধরেছে ছেলেটা। আর একটু হ'লে মরে' যেত।...ভাবছি, কবে এই সব পাপ দূর হবে বাড়ি থেকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মনে হচ্ছে, এদের দূর করতে চাইছি কেন! এরাই তো আমার আত্মীয়!

বিধুবাবুর ছেলে পটল কাল রাত্রে মারা গেছে। মেডিকেল

কলেজের আপ-টু-ডেট্ ছাত্র বিলাস তাকে বাঁচাতে পারে নি। আমি তার চিকিৎসা আর করছিলাম না। করলেই বাঁচত কি ?

রোগী আসে, রোগী যায়। কেউ বাঁচে, কেউ মরে। কিন্তু মনের উপর কেউ তো দাগ রেখে যায় না। আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স কিছু বাড়ে শুধু। মনটা যেন নির্মম আয়নার মতো! কোনও ছবিই ধরে রাখে না। যদি ক্যামেরার মতো হ'ত তাহলে কি ভালো হ'ত? অত ছবি রাখতাম কোথায়। মনের চিত্রশালায় অত জায়গা কি আছে? হঠাৎ মনে হ'ল আছে বই কি। অনেক জায়গা আছে। কিন্তু রাখবার মতো ছবি একটাও পেয়েছি কি ?

আজ লক্ষ্মীবাজারে রোগী দেখতে গিয়ে অদ্ভুত জিনিস দেখে এসেছি একটা। লক্ষ্মীবাজার এখান থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে। লক্ষ্মীবাজারের প্রসিদ্ধি তার বাজারের জন্য নয়, তার গড়ের জন্য। প্রায় আধ মাইলব্যাপী বিরাট বিরাট অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ আছে সেখানে। প্রবাদ, বহুকাল আগে সেখানে এক রাজবংশ বাস করতেন। তাঁদের উপাধি ছিল চৌধুরী। চৌধুরী বংশের এক রাজা লক্ষ্মী চৌধুরী (যাঁর নামের স্মৃতি বহন করছে লক্ষ্মীবাজার গ্রাম) তাঁর যৌবনকালে নব-বিবাহিতা পত্নীকে নিয়ে সহসা অন্তর্ধান করেন। কোথায় গেলেন, কেন গেলেন তা কেউ জানে না। তিনি আর ফেরেন নি। কেউ বলে সন্ন্যাসী হ'য়ে গেছেন, কেউ বলে মারা গেছেন, কারও মতে তিনি পর্তুগীজ বম্বেটেদের হাতে পড়েছিলেন, তারা তাঁকে আর তাঁর স্ত্রীকে আরবদের কাছে বিক্রি করে' দিয়েছে। এই ধরনের নানা জনশ্রুতি আছে তাঁর সম্বন্ধে। মোট কথা তিনি

আর ফেরেন নি। কোন খবরও পাঠান নি। তিনি চলে' যাবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য অত বড় চৌধুরী গড় খালি হ'য়ে যায় নি। তাঁদের বংশের অনেকেই বেঁচে ছিলেন সেখানে অনেকদিন ধরে'। কিন্তু কালক্রমে ক্রমশঃ সব খালি হ'য়ে গেল। বংশে ছেলে হ'ল না কারও, মৃত্যুর করালগ্রাসে অবলুপ্ত হ'য়ে গেল অত বড় বংশ। বংশের শেষ প্রদীপ (কমলাপতি চৌধুরী) নির্বাপিত হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। তারপর থেকে প্রেতপুরীর মতো পড়ে' আছে অত বড় গড়টা। চারিদিকে বনজঙ্গল গজিয়েছে, বড় বড় অশ্বত্থ বট বিদীর্ণ করেছে বিশাল অট্টালিকার পঞ্জরকে। জঙ্গলে সাপ আর শেয়ালের আড্ডা, গাছের মাথায় মাথায় শকুনদের। বাড়িটার ভাঙা ঘরগুলোর মধ্যে ভীষণ-দর্শন প্যাঁচাও আছে নাকি। দিনের বেলাতেও চৌধুরী গড়ের জঙ্গলে যায় না কেউ। কিছুদিন আগে এক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মালমসলা সংগ্রহ করতে এসেছিলেন। সর্পাঘাতে মারা গেছেন। এ ঘটনার পর থেকে আর কেউ ওদিক মাড়ায় না।

আজ কিন্তু দেখে এলাম সেখানে লোকে লোকারণ্য, এক মহাসমারোহ পড়ে' গেছে। দীর্ঘকায় এক কাবুলী ঘোড়সোয়ার এসে হাজির হয়েছে সেখানে। সে আকারে ও ভাষায় কাবুলী বটে, কিন্তু তার পোশাকটা প্রায় বাঙালীরই মতো। তার ঘোড়াটাও প্রকাণ্ড। অত বড় ঘোড়া আমি অন্ততঃ দেখি নি। সে নিজের নাম বলেছে, অ্যাচুট্অ্যাণ্ড। পরে বোঝা গেল ওটা অচ্যুতানন্দের কাবুলী সংস্করণ। তার ভাষা কেউ বুঝতে পারছিল না। পাশের গ্রামের আগা সাহেব এসে তার বক্তব্যের মর্মোদ্ধার করেছেন। আগন্তুক পোস্তু ভাষায় আগা সাহেবকে যা বলেছে তাও বিস্ময়কর। সে বলেছে যে সে গৃহত্যাগী রাজা লক্ষ্মী চৌধুরীর বংশধর। লক্ষ্মী চৌধুরী কেন গৃহত্যাগ

করেছিলেন তারই বিবরণ নিয়ে সে লক্ষ্মীবাজারে এসেছে। 'ল্যাখি চোড্‌রি'কে সে নিজে কখনও দেখে নি। তার জন্মের বহুপূর্বে তিনি মারা গেছেন। তিনি ছিলেন তার ঠাকুরদার ঠাকুরদা। তিনি তাঁর গৃহত্যাগের বিবরণ একটি খাতায় লিখে রেখেছিলেন এবং মৃত্যুকালে বলে' গিয়েছিলেন খাতাটি যেন লক্ষ্মীবাজারে পৌঁছে দেওয়া হয়। কিন্তু এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে' এখানে আসা এর আগে সম্ভবপর হয় নি এতদিন। তারপর বললে—"হঠাৎ আমরা একদিন লক্ষ্য করলাম যে খাতার কাগজ মলিন এবং ভঙ্গুর হ'য়ে গেছে। হাত দিলে ভাজা পাঁপরের মতো গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। তখন মনে হ'ল, আর দেরি করা উচিত নয়, আর দেরি করলে তাঁর শেষ ইচ্ছা আমরা পূর্ণ করতে পারব না। তাই আমি এই খাতা নিয়ে এসেছি। ঘোড়াটি শোণপুরের মেলায় কিনেছি। ইচ্ছে আছে, ফিরবার সময় ট্রেনে যাব না, ঘোড়ার পিঠেই যাব।"

লক্ষ্মী চৌধুরীর লিখিত বিবরণের অধিকাংশই প্রায় পড়া যায় নি। লেখা অস্পষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু যেটুকু পড়া গেছে সেটুকু প্রণিধানযোগ্য। তার মর্ম এই—"আমি এটা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি যে আমাদের কেউ ভালবাসে না। আমরা প্রতিপত্তিশালী, আমরা ধনী তাই সকলে বাধ্য হ'য়ে আমাদের আজ্ঞাবহ হ'য়ে থাকে। সেবা করে অর্থের বিনিময়ে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য অথবা ভয়ে। কারও মনে আমরা প্রেম সঞ্চার করতে পারি নি। এই নকল প্রভুত্বের সিংহাসনে বসে' আমাদের পূর্বপুরুষরা সুখ পেয়েছেন, কিন্তু আমি পাচ্ছি না। আমার প্রতিমুহূর্তেই মনে হচ্ছে আমি যেন পাশবিক শক্তিবলে দুর্বলদের পীড়ন করছি। এ আমার পক্ষে অসহ্য। এখানে থেকে আমার সমস্ত সম্পত্তি যদি বিলিয়ে দিই তাহলেও আমার কাম্য সুখ আমি পাব না। কারণ এতদিন যে রূপে সকলে

আমাকে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে সে অভ্যাসের মোহ তারা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবে না। আমি এমন কোন অপরিচিত স্থানে যেতে চাই যেখানে আমার কৌলীন্যের পরিচয় অর্থ বা প্রতিপত্তি দিয়ে কেউ মাপবে না, আমার চারিত্রিক মহত্ত্ব দিয়ে মাপবে। যে সমাজে আমি অপরিচিত অচেনা আগন্তুক সেই সমাজে গিয়েই আমি নূতন রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। আমার পূর্বপুরুষদের অর্জিত সম্পত্তি তাই আমি ত্যাগ করে' চলে' যাচ্ছি। আমার বংশের অন্যান্য শরিকরা অথবা গ্রামবাসীরা সে সম্পত্তির যে কোনওরূপ সংব্যবস্থা করতে পারেন করুন, আমার আপত্তি নেই। পৈত্রিক সম্পত্তির উপর আমার সমস্ত দাবি আমি ত্যাগ করলাম।"

···রাজা লক্ষ্মী চৌধুরী যা বলেছেন তা কি সকলের সম্বন্ধেই সত্য নয়? আমাদের দেশে এরকম মহাপুরুষ আরও অনেক আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি।

প্রাণ-পতি সাধু নাম। সুদখোর বেনে। কারও প্রাণ-পতি হ'তে পারে নি, ধন-পতি হয়েছে অনেকের। অনেকের সম্পত্তি নিলাম করিয়েছে। সাধুও নয়, অসাধু। জাল দলিল বার করে' সর্বনাশ করেছে অনেকের। আমি তার বাড়িতে চিকিৎসা করেছিলাম কিছুদিন। অনেক ফি বাকি আছে। আজ দেব কাল দেব করছে। এখনও দেয় নি। ওষুধের দামও বাকি আছে অনেক। আজ সকালে এসে বলছিল সে নাগেদের দোকানে জিগ্যেস করে' দেখেছে ওষুধের দাম না কি আমি অনেক বেশী নিয়েছি। অর্ধেক হওয়া উচিত। দারোয়ান দিয়ে দূর করে' দিলুম লোকটাকে। দারোয়ান যখন তার হাত ধরে' টেনে বারান্দা থেকে নামিয়ে দিলে তখন

ভেবেছিলুম একটা প্রতিবাদ অন্ততঃ করবে। কিন্তু কিছু করলে না, সুট সুট করে' চলে' গেল। অথচ শুনেছি ওর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নাকি লক্ষ টাকার উপর।

রায়সাহেব উপাধি দিয়ে গভর্নমেণ্ট অকস্মাৎ আমাকে বিব্রত করেছেন। আমি এর জন্যে কিছুমাত্র চেষ্টা করি নি, পাবার জন্য বিন্দুমাত্র লালায়িতও ছিলাম না। কমিশনার সাহেবের হাইড্রোসিলটি ভাল করে' অপারেশন করে' দিয়েছিলাম বলেই সম্ভবতঃ এই অযাচিত পুরস্কারটি পেলাম। এ যেন সাপের ছুঁচো-গেলা হয়েছে। গিলতেও পারছি না, ফেলতেও পারছি না। আমার চেনা-শোনা অনেকেই কিন্তু গদগদ হ'য়ে পড়েছেন দেখছি। রোজই অভিনন্দন জানিয়ে পত্র আসছে। আমার শালী 'রায়সাহেব ডক্‌টার সদাশিব ভট্টাচার্য এম-বি.' ইংরেজি হরফে ছাপিয়ে লেটার প্যাড করিয়ে পাঠিয়েছে জলন্ধর থেকে। আমার যে বন্ধুর সঙ্গে কোনকালে বন্ধুত্ব ছিল না, যিনি বহুকাল আগে কিছুদিনের জন্য আমার সহপাঠী ছিলেন মাত্র, তিনি সন্দেশ খাওয়াবার দাবি জানিয়ে দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন। হে সদাশয় কমিশনার সাহেব, এ কি বিপদে ফেললে আমাকে!

আজ আমার ডিস্‌পেনসারির সামনে বেশ একটা মজার দৃশ্য দেখলাম। উচ্চকণ্ঠের কলরব শুনে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখি একদল হাফ্‌প্যাণ্টপরা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে উত্তেজিত হ'য়ে। কথাবার্তাও উত্তেজিত। কারণটাও চোখে পড়ল। হাফ্‌প্যাণ্টপরা ছেলেগুলোর মধ্যে লক্ষ্য করলাম একজন আড়ময়লা খাকি একটা ফুলপ্যাণ্ট পরে' রয়েছে। তার হাতে একটা এয়ারগান। আর

একটা ছেলের হাতে একটা মরা পায়রা। বুঝলাম 'এয়ারগান'টিই ওই হতভাগ্য জীবের ভবলীলার অবসান ঘটিয়েছে। ফুলপ্যাণ্টপরা ছেলেটার মুখের গর্বিত ভাব লক্ষ্য' করে অনুমান করলাম সে-ই বোধ হয় শিকারী। একটা রোগাগোছর ছেলে চীৎকার করে' বলছে—আমিই তো দেখিয়ে দিয়েছিলাম পায়রাটাকে। মোটা বেঁটে চশমাপরা আর একটা ছেলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল—মিথ্যুক কোথাকার! তুমি দেখিয়ে দিয়েছিলে, না আমি? পাশেই ছেঁড়া-কেড্‌স্-পরা ট্যারা যে ছেলেটা দাঁড়িয়েছিল সে রুখে এগিয়ে এল। বেঁটে ছেলেটাকে কনুই দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ফুলপ্যাণ্ট-পরা ছেলেটাকে সম্বোধন করে' বললে—তুমিই বল না। ওই ফ্লাওয়ার মিলের ফোকরে যে পায়রা থাকে তা আমিই তোমাকে প্রথমে বলিনি? আর একজন ছেলে বলে' উঠল—মাইরি আর কি! বুঝলাম ওই বারো-চোদ্দটা ছেলের প্রত্যেকেই ওই মৃত পায়রাটির উপর অধিকার সাব্যস্ত করবার চেষ্টা করছে। প্রত্যেকেরই চোখের দৃষ্টি লোলুপ। কিন্তু হায়, পায়রা যে মাত্র একটি।

এখানে কাল শখের থিয়েটারে 'কর্ণার্জুন' হয়েছিল। আমি যেতে পারিনি। মনু গিয়েছিল। মোটরে তাকে পৌঁছে দিয়ে আমি 'কলে' বেরিয়ে গিয়েছিলাম। কথা ছিল ফেরবার সময়ে তাকে তুলে নিয়ে যাব। কিন্তু ফেরবার সময় রাস্তায় মোটরটা গেল বিগড়ে। ঠিক করতে বেশ দেরি হ'য়ে গেল। মনুকে হেঁটেই ফিরতে হয়েছিল। মনু বললে—ফেরবার সময় দেখলুম মণিবাবু মোটরে করে' যাচ্ছেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও রয়েছে। আমাকে দেখে গাড়ী থামিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—গাড়ি কোথায়?

বললাম, আসবার কথা ছিল, কি জানি কেন আসে নি। শুনে মণিবাবু মুচকি হেসে গাড়ী হাঁকিয়ে চলে' গেলেন। তাঁর এটুকু ভদ্রতা হ'ল না যে আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেন।

শহরের লোকে জানে মণিমোহন বসু আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু!···একটু পরে সুবলবাবু এলেন। তিনি আমার এবং মণিমোহন উভয়েরই বন্ধু। ইংরেজিতে যাকে 'কমন ফ্রেণ্ড' বলে তাই। তাঁকে মণিবাবুর ব্যবহারের কথাটা বললুম। তিনি হেসে উত্তর দিলেন, —এতেই আশ্চর্য হচ্ছেন? ওর বাড়ির উঠোনে একটা পেয়ারা গাছ আছে। তার ফল কখনও খেয়েছেন একটাও? প্রত্যেকটি পেয়ারা বিক্রি করে। কখনও হাত তুলে কাউকে কিছু দিতে জানে না। হাড় চামার। আমার ধারণা ছিল মণিবাবু সুবলবাবুর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু বন্ধুত্বের নীচে যে এমন বিষ-ফল্গু বহমান তা জানতাম না।

আজ আমার বাগানের ক্রোটন গাছ দুটোর শ্রী দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। প্রাণের প্রাচুর্যে যেন উথলে উঠেছে রঙে, রূপে, লাবণ্যে। তার পরই মনে পড়ল রাজেনবাবুর কথা। তিনিই এই ক্রোটনের ডাল দুটো এনে পুঁতে দিয়েছিলেন। আমি বাগান ভালবাসি, রাজেনবাবু আমাকে ভালবাসতেন। এই দুই ভালবাসার মণি-কাঞ্চন যোগ হয়েছে ওই ক্রোটন গাছ দুটিতে। রাজেনবাবু আজ কোথায় জানি না, তাঁর যে দান সামান্য বলে মনে হয়েছিল, তাই আজ অসামান্য হ'য়ে উঠেছে। আজ মনে হচ্ছে মানবতার নিগূঢ় মহত্ত্ব যেন মূর্ত হ'য়ে উঠেছে ওই গাছ দুটিতে। ঝারিতে করে' জল এনে নিজে হাতে গাছ দুটিকে স্নান করালাম। মালীটা অবাক

হ'য়ে গেল। সে বুঝতে পারল না যে আমি বাইরে গাছকে স্নান করাচ্ছি বটে, কিন্তু মনে মনে অভিষিক্ত করছি রাজেনবাবুকে কৃতজ্ঞতা দিয়ে। আজ এটা আমার জীবনে পরম দিন।

সুরেন বক্‌সি তাঁর বড় জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে আজ এসেছিলেন। তাঁর শৌখিন স্প্যানিয়েলটার কানে ঘা হয়েছে তাই দেখাবার জন্যে। এ অঞ্চলে পশু-চিকিৎসক বলে নেই। দরকার হ'লে পশুদের চিকিৎসা আমিই করি। আমি ঘায়ে লাগাবার একটা ওষুধ আমার ডিস্‌পেনসারি থেকেই দিলাম, আর একটা ইন্‌জেক্‌-শনের কথাও বললাম। বললাম, ওটা এখানে কোথাও পাবেন না, ক'লকাতা থেকে আনাতে হবে। দামী ওষুধ। সুরেন বক্‌সি একটু দম্ভভরেই উত্তর দিলেন, দামের জন্য আমি পরোয়া করি না, আপনি আমার নামে ভি. পি. করতে লিখে দিন। লিখে দিলাম। তারপর তাঁকে বিদায় দেবার জন্য বাইরে এসে একটা মজার জিনিস চোখে পড়ল। দেখলাম তাঁর সহিসের বাঁ কানে একটা ঘা হ'য়ে কানটা বেঁকে গেছে। সহিসটি আমাকে দেখে সেলাম করলে। বক্‌সি মশায়ের বাড়িতে অনেকদিন ধরে' আছে লোকটি। বক্‌সি মশাই কুকুরের কান সম্বন্ধে এত সচেতেন, অথচ সহিসের কান সম্বন্ধে এত উদাসীন কেন বুঝতে পারলাম না। একবার মনে হ'ল সহিসের কানের দিকে ওঁর দৃষ্টি আর্কষণ করি। আবার তখনই মনে হ'ল —না থাক, কি দরকার আমার। এ কথা কেন মনে হ'ল কে জানে। এখন মনে হচ্ছে সুরেন বক্‌সি তো অদ্ভুত লোক বটেনই, আমিও কম অদ্ভুত নই।

সোহাগের বিয়ে খুব ধুমধাম করে' হয়ে গেল। আমার একমাত্র মা-মরা মেয়েটিকে যে সৎপাত্রের হাতে সম্প্রদান করতে পেরেছি এতে আমার আনন্দিত হওয়া উচিত। আনন্দিত যে হই নি তা নয় কিন্তু আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণও হয়েছি। যদিও মুখে দেঁতো হাসি হেসে সবাই বললেন—বাঃ, চমৎকার হয়েছে, খুব আনন্দের কথা। কিন্তু সবাই যে আনন্দিত হন নি, অনেকেই যে ঈর্ষ্যা-ক্লিষ্ট হয়েছেন তা বোঝা গেল তাঁদের মুখের ভাব-ভঙ্গীতে। পরশ্রীকাতরতা জিনিসটা বিষ্ঠার মতো, ফুল দিয়ে চাপা দিলেও তার দুর্গন্ধটা গোপন করা যায় না। সেটা প্রকাশ হ'য়ে পড়েই। সরলতা এবং মহত্ত্ব যেমন চোখে মুখে স্বতঃস্ফূর্ত হয়, কুটিলতা এবং নীচতাও তেমনি হয়। প্রকাশ্যভাবে খুঁতও ধরেছেন অনেকে। অনেককে নাকি ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠানো হয় নি, অনেককে নাকি দেরিতে পাঠানো হয়েছে। হয়তো আমার অজ্ঞাতসারে এসব ত্রুটি ঘটেছে, কিন্তু যাঁরা সত্যিই আমার আত্মীয় বা বন্ধু, তাঁরা এসব ত্রুটি নিয়ে মাথা ঘামাবেন কেন? বিনা নিমন্ত্রণেই তো তাঁদের আমার বাড়িতে আসবার অধিকার আছে, এসেওছেন কতবার, থেকে গেছেন খেয়ে গেছেন। যাঁরা দূরে আছেন তাঁদের সকলকেই আমি চিঠি লিখেছিলাম, বিয়ের কথা সকলেই জানতেন, ওই ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্রটার জন্যে তাঁরা অপেক্ষা করে' ছিলেন কেন বুঝতে পারছি না।

এই শহরেও আমার দুই একজন তথাকথিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুও নিমন্ত্রণ-না-পাওয়ার ছুতো করে' সরে ছিলেন। একজন বললেন—বরবধূকে উপহার দেওয়াটা এড়াবার জন্যেই আসেন নি। এ কথাটা বিশ্বাস হয় না। একটা ঝুটো আত্মসম্মানের কবলে পড়েছেন তাঁরা। আমাকে সত্যি যদি ভালবাসতেন বিনা-নিমন্ত্রণেই আসতেন। ভালবাসা জিনিসটা সত্যই বড় দুর্লভ।

এই বিয়ে উপলক্ষে আরও যে দু'একটা ঘটনা ঘটেছে তা আরও মর্মান্তিক। বাড়িতে ভিয়ান বসিয়ে অনেক মিষ্টান্ন করিয়েছিলাম। মিষ্টান্নের তদারক করবার ভার ছিল গোপীনাথের উপর। লোকটি অনেকদিনের বিশ্বাসী চাকর, সোহাগকে কোলে-পিঠে করে' মানুষ করেছে। সে যা বললে তা শুনে চক্ষুস্থির হয়ে গেছে আমার। সে বললে, সোনাপুকুরের বৌদি এবং তার ছেলে-মেয়েরা নাকি মিষ্টান্নের ভাঁড়ারে ঢুকে মিষ্টান্ন চুরি করত। বালতি বালতি পানতোয়া, রসগোল্লা, মিহিদানা সরিয়েছে। যদিও খেত কষ্ট হ'ত না, কিন্তু খায় নি, সব ফেলে দিয়েছে পাঁদাড়ে। আমাকে অপ্রস্তুত করবার চেষ্টা। তারা যে ফেলে দিচ্ছে একথা গোপীনাথ প্রথমে বুঝতে পারে নি। বুঝতে পারামাত্রই আর কাউকে ঢুকতে দেয় নি সে। এতে না কি অনেক আত্মীয়-আত্মীয়া অপমানিত বোধ করেছেন। এধরনের আত্মীয়-আত্মীয়াদের কবল থেকে কবে আমরা পরিত্রাণ পাব ?

আর একদল আত্মীয় চিঠি লিখেছেন তাঁদের আসবার খুবই ইচ্ছে ছিল কিন্তু অনিবার্য 'কারণ' বশতঃ আসতে পারে নি। পরে জানলাম অনিবার্য কারণটা আর্থিক। নিমন্ত্রণ-পত্রের সঙ্গে আমার নাকি গাড়িভাড়াও পাঠানো উচিত ছিল। গাড়িভাড়া আমি দিতাম কিন্তু নিমন্ত্রণ-পত্রের সঙ্গে সেটা পাঠানো কি শোভন হ'ত। সে কথার উল্লেখ করাও যে অশোভন! এই আমাদের সমাজ, এই আমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের নমুনা! একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল। যিনি গাড়িভাড়ার জন্যে আসেন নি, তাঁর ছেলের বিয়েতে আমি সপরিবারে গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তো আমাকে গাড়িভাড়া দেন নি, দেবার প্রস্তাবও করেন নি। অথচ তিনি যে খুব গরীব লোক তা-ও নন, ছেলের বিয়েতে নগদ মোটা পণও নিয়েছিলেন!

আজ হঠাৎ নুটবিহারীবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল। মুনসেফ ছিলেন ভদ্রলোক, সাবজজ্ হ'লে রিটায়ার করেছেন। যখন সাবজজ্ ছিলেন তখন মোটর ছিল, চাপরাসী ছিল, স্যুট পরতেন, হাকিমি গাম্ভীর্যে বিচরণ করতেন বাছা বাছা অফিসারদের সমাজে। আজ হঠাৎ তাঁকে দেখলাম রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছেন সাধারণ বাঙালী পোশাক পরে'। আড়ময়লা ধুতি, আড়ময়লা শার্ট, পায়ে হতশ্রী একজোড়া অ্যালবার্ট শু, হাতে বাজারের থলি। মুখে বার্ধক্যের চিহ্ন, চুলে পাক ধরেছে, সামনের দাঁত নেই। তিনি যে আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তা বুঝতে পারিনি। আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, দেখে মনে হ'ল আমাকে বোধহয় চিনতে পারেন নি। বললাম, "নুটবিহারীবাবু যে। নমস্কার। চিনতে পারছেন ?" মুখটা হঠাৎ কালো হ'য়ে গেল তাঁর।

"কে, ও, ডাক্তারবাবু! আজকাল এখানেই আছেন না কি ?"

"হাঁ, মাস দুই হ'ল বদলি হ'য়ে এসেছি।"

"প্রমোশন হ'ল ?"

"মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছেছি—"

"সিভিল সার্জন হয়েছেন তাহলে—। ভাল—"

"আপনিও বদলি হ'য়ে এসেছেন না কি এখানে ?"

"আমি রিটায়ার করেছি। এখানেই আছি একটা বাড়িভাড়া করে'—"

"কোথায় আছেন ?"

ঠিকানাটা জেনে নিলাম। সন্ধ্যার পর গেলাম তাঁর কাছে। অনেক দিন এক ডিস্ট্রিক্টে একসঙ্গে ছিলাম। গিয়ে দেখলাম একটা আড়ময়লা লুঙ্গী পরে' একটা ভাঙা বেতের চেয়ারে বসে',

আছেন। আমাকে দেখে নিজেই আর একটা চেয়ার টেনে বার করে' আনলেন। সেটাও খুব মজবুত বলে' মনে হ'ল না। বসলুম। এক কাপ চা-ও খাওয়ালেন। ময়লা পেয়ালায় অতি জোলো চা। গল্প হ'ল খানিকক্ষণ। তাঁর চাকরি-জীবনেরই গল্প। কবে কোন্ সাহেব তাঁকে কি বলেছিল, কার কার চক্রান্তে তাঁর আশানুরূপ উন্নতি হ'ল না—এই সব কথা খালি। সারাক্ষণ যেন হায় হায় করে' গেলেন। চুপ করে' শুনলাম সব। ভাল লাগছিল না, তবু শুনলাম। শেষে জিজ্ঞাসা করলাম—"এখন কি করেন?"

"বাজার করি আর বাড়ির ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলোকে সামলাই। আর সময় পেলেই অঙ্ক কষি কি করে' আমার পেন্সন দিয়ে সংসার চালাব। সকালবেলা অবশ্য পূজো করি খানিকক্ষণ, স্বামী জীবনানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়েছি। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে চলে' যাই। চিঠিপত্র লেখালিখি করছি—"

মুটবিহারীর সম্বন্ধে একটা খবর জানি। ছাত্রজীবনে তিনি ইংরেজি সাহিত্য ভাল করে' পড়েছিলেন। ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীর এম-এ। শেক্‌স্‌পীয়র আর ব্রাউনিং সম্বন্ধে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর নিজের জীবনে কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়র বা ব্রাউনিংয়ের চিহ্নমাত্র দেখলাম না। তাঁদের পরীক্ষার খাতায় ফেলে এসেছেন, সঙ্গে করে' আনতে পারেন নি। সাধারণ লোকের মতোই হায় হায় করছেন।

তপেনবাবু আমার প্রতিবেশী। এখানে এক আফিসে কেরানী-গিরি করেন। বিয়ে করেন নি। বলেন চাকরির উন্নতি না হ'লে বিয়ে করবেন না।

তপেনবাবুর বাড়িতে কিন্তু তপেনবাবুর চেয়ে অনেক বড় আসন তপেনবাবুর বোন রঙ্গনার। তাকে ঘিরেই বাড়িতে সর্বদাই আসর সরগরম। মেয়েটি রূপসী নয়, রং কালোই। কিন্তু হাবভাবে মুগ্ধ করে' দেয়। চোখের দৃষ্টিতে এবং যৌবনের সাবলীলতায় আগুন আছে। সেই আগুনে পুড়বার জন্যে একদল পুং-পতঙ্গ প্রায়ই সন্ধ্যের সময় ভিড় করে। মেয়েটি নাচ গান অভিনয় সব বিষয়েই পটীয়সী। তবলা আর ঘুঙুরের আওয়াজ প্রায়ই শুনতে পাই। তপেনবাবুর আপিসের যিনি হর্তাকর্তা বিধাতা তিনি প্রবীণ লোক। তিনিও রোজ আসেন সন্ধ্যাবেলায়। সুতরাং মনে হচ্ছে এবার তপেনবাবুর চাকরির উন্নতি হবেই!

দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক মহাভারতের আমলেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু আগে সমাজে তাদের স্থান ছিল একটা বিশেষ পল্লীতে, বিশেষ সীমার মধ্যে। গৃহস্থের অঙ্গনে তাদের বসতি ছিল না। এখন আমাদের সমাজ ভেঙে যাচ্ছে, তাই সব সীমরেখাও লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। পুরনারীদের মধ্যে কে বরনারী, কে বারাঙ্গনা তা এখন ঠিক করা মুশকিল। মালা ভ্রমে সাপকে গলায় ঝুলিয়ে বেড়াচ্ছেন অনেকেই। এ দেশেও ফরাসী সমাজ গজিয়ে উঠল।

একটা নূতন ফেরিওলা এসেছিল। এ শহরের প্রায় সব ফেরিওলাকেই চিনি আমি। এ লোকটি অচেনা। তার কাছ থেকে একটা ছুরি কিনলাম। তারপর জিগ্যেস করলাম—এখানে কোথায় আছ? সে বললে ধরমশালায় আছি। কোথাও আমি বেশী দিন থাকি না। এক সপ্তাহের বেশী কোথাও থাকি নি। ভারতবর্ষের সব শহরেই দু'চার দিন করে' থাকবার ইচ্ছা আছে তার।

তার জীবনে বেড়ানোটাই লক্ষ্য, ফেরি করাটা উপলক্ষ মাত্র। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এক শহরে বেশী দিন থাক না কেন? সে হেসে বললে, বেশী দিন থাকলে মন খারাপ হ'য়ে যায় বাবু। বেশী মাখামাখি করলে মানুষের চক্‌চকে ভাবটা আর থাকে না, গিল্টি বেরিয়ে পড়ে, মন খারাপ হ'য়ে যায়।

তার কথা শুনে চমৎকৃত হয়ে গেলাম। এরকম দার্শনিক ফেরিওলা আগে কখনও দেখিনি। ফেরিওলার কথা শুনে নবকিশোরের কথা মনে পড়ল। লোকটাকে দেবতা মনে করেছিলাম। তার চেহারায় কথাবার্তায় সত্যিই একটা দেবত্ব ছিল। কিন্তু বেশী মাখামাখি করবার পর গিল্টি বেরিয়ে পড়ল। একদিন সকালে দেখি সে উধাও হয়েছে। আর উধাও হয়েছে আমার ক্যাশবাক্সটা। তাতে আড়াই শ' টাকা, তুটো গিনি এবং সোনার ঘড়িটা ছিল।

এখান থেকে কিছুদূরে বড় রাস্তার উপর যে পুলটি ছিল সেটি ভেঙে গেছে। পুল ভেঙে যাওয়া আশ্চর্য নয় কিন্তু আশ্চর্য হলুম স্বয়ং একজিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়ার সেটির তদারক করতে এসেছেন দেখে। মফঃস্বলের এক পাড়াগাঁয়ের রাস্তায় পুল ভেঙেছে তার জন্যে স্বয়ং একজিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়ার এসেছেন, এ যে মশা মারতে কামান দাগা। সাধারণতঃ সাব-ওভারশিয়ার বা বড় জোর ওভারশিয়ার এসব ছোটখাটো ব্যাপারে আসেন এবং তাঁরা যা রিপোর্ট দেন তদনুসারেই গভর্নমেণ্ট টাকা খরচ করেন। একজিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়ারের আবির্ভাব একটু অস্বাভাবিক বলে' ঠেকল।

তার পরদিন ভদ্রলোক নিজেই এলেন আমার ডিস্‌পেনসারিতে

একশিশি কামিনেটিভ মিক্শ্চার নিতে। বললেন—"ওটা আমি সর্বদা সঙ্গে রাখি এবং দু'বার করে' খাই। খেলে ভাল থাকি। এক শিশি আমাকে করে' দিন।" করে' দিলাম। তারপর আলাপ হ'ল তাঁর সঙ্গে। দেখলাম নগেনবাবু বেশ সদাশয় এবং রসিক। বিলেত-ফেরত, বড় চাকরি করেন, কিন্তু অহংকারের লেশমাত্র নেই। চমৎকার হাসিখুশী লোক। খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করতেই বললেন —"ও, তাহালে তো বেঁচে যাই মশাই। চাপরাসীর হাতের রান্না খেতে খেতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'য়ে গেছে। পেঁয়াজ আর লঙ্কা ছাড়া ছাড়া তৃতীয় কোন মসলা জানা নেই মহাপ্রভুদের। কিছু যদি মনে না করেন, একটা অনুরোধ করবো।" "কি বলুন—।" "একটু শুক্তো করাবেন। মুখটা বদলে নেব।" বললাম, "বেশ তো, বেশ তো—এ আর বেশী কথা কি।" আলাপ ঘনিষ্ঠতর হ'তে জিগ্যেস করলুম—"আচ্ছা, এই অজ পাড়র্গাঁয়ের পুল দেখতে আপনি এসেছেন কেন বুঝতে পারছি না।" একটু হেসে বললেন—"ওভার-শিয়ার চক্রবর্তী আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছে।"

জিগ্যেস করলাম—"কে তিনি ?"

হেসে বললেন—"তিনি একজন পুরানো পাপী। এখন রিটায়ার করেছেন। এরকম ধূর্ত লোক আমি আর জীবনে কখনও দেখিনি। কালো বামুন। কুচকুচে কালো রং। চোখমুখে একটা শেয়াল-শেয়াল ভাব। প্রতিবছরই সে একটা পুরানো পুলের মেরামতি বাবদ একটা বিল করতো। আমি আসবার আগে থেকেই করত। আমার আগে অন্ততঃ পাঁচজন এক্জিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়ার তার এ বিল পাস করেছে। আমিও করে' দিতাম। পুলটি ছিল একটি পাড়াগাঁয়ের রাস্তায়। সেখানে থেকে রেলোয়ে স্টেশন কুড়ি মাইল দূরে। স্টেশন থেকে গরুর গাড়ি করে' কিংবা বাইক

করে' কিংবা হেঁটে সে জায়গায় পৌঁছাতে হয়। এ কষ্ট স্বীকার করে' কোনও এক্জিকিউটিভ ইন্‌জিনয়ার সে পুল দেখতে যায় নি। আমিও যাই নি। রিপেয়ারের বিল প্রতি বছর পাস হয়ে যেত। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। স্টেশন থেকে ওই কুড়ি মাইল রাস্তা, জঘন্য ছিল সেটা। পাবলিকে অনেকদিন থেকে ওটা পাকা রাস্তা করে' দেবার জন্যে আন্দোলন করছিল। হঠাৎ ঠিক হ'য়ে গেল ওটা পাকা করা হবে। আমাকে যেতে হ'ল সেখানে। ঠিক তার আগেই ওভারশিয়ার চক্রবর্তী ওখানকার পুল রিপেয়ারের জন্য টাকা চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম—'পুলটা এবার দেখব। তারপর তোমার বিল স্যাংশন করব।' গিয়ে কি দেখলুম জানেন?" "কি—?" "কোনও পুল নেই! Non-existent পুলের রিপেয়ার খরচ বছরের পর বছর নিয়ে যাচ্ছে চক্রবর্তী!"

"বলেন কি! কি করলেন?"

"তারপর একটা নাট্যকীয় কাণ্ড করলে চক্রবর্তী। আমার পায়ে পড়ে' পা জড়িয়ে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগল। শৃগালের চোখে কুমীরের অশ্রু ঝরনার মতো পড়তে লাগল। কিছুতেই পা ছাড়ে না। শেষটা তাকে বলতে হ'ল—'আচ্ছা, এবার তোমায় মাপ করলুম, কিন্তু আর এরকম যেন না হয়।' পরের বছর দেখি আবার চক্রবর্তীর সেই পুল রিপেয়ারের বিল এসেছে! তার দিকে চাইতেই সে বললে—'আমার কথাটা শুনুন আগে সার। বিল এনেছি, কারণ বিল না দিলে অডিট্ ধরবে না? যে পুল গত দশ বছর ধরে' বছর-বছর মেরামত হচ্ছে, এবার সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকলে সন্দেহ হবে তাদের? এবার বিলটা পাস করে' দিন, আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজটা ভেঙে ফেলবার একটা অর্ডার আর এস্টিমেটও দিয়ে দিন। তারপর থেকে আর বিল আনব না।" হো হো করে' হেসে

উঠলেন নগেনবাবু। তারপর বললেন, সেই থেকে কোনও পুল ভাঙলে, তা সে যত ছোটই হোক, নিজের চোখে দেখে আসি।”

কাল রাত্রি এগারোটার সময় বিপিন কাকা কোন খবর না দিয়ে এসে উপস্থিত তাঁর বিধবা মেয়েটিকে নিয়ে। বিপিন কাকার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই। বাবাকে উনি দাদা বলতেন বলে' আমরা ওঁকে কাকা বলি। এসেই একটি মিথ্যে কথা বললেন—চিঠি দিয়েছিলাম, পাওনি? চিঠি হারানো যে অসম্ভব তা নয়, কিন্তু সাধারণতঃ আমার চিঠি হারায় না। তাছাড়া তাঁর চোখমুখ দেখেই মনে হচ্ছিল তিনি মিথ্যে কথা বলছেন। বিপিন কাকা ধার্মিক মানুষ। রাত এগারোটার সময় এসে তিনি গরম জলে স্নান করলেন। তারপর পূজো করলেন একঘণ্টা ধরে'। তারপর চা খেয়ে গল্প করলেন একটু। মনু অত রাত্রে উনুন নিকিয়ে শুদ্ধাচারে তাঁর মেয়ের জন্য লুচি, বেগুন ভাজা, আলুর দম করে' দিলে। জিগ্যেস করলাম—“বিপিন কাকা, হঠাৎ এসে পড়লেন যে। কখনও তো খবর নেন না—”

একমুখ হেসে বিপিন কাকা বললেন, “তোমার জন্যে মনটা বড় উতলা হ'য়ে উঠলো। অনেকদিন দেখি নি তো—”

“আপনার মেয়েকে সঙ্গে এনেছেন কেন—”

“টুপিকে? পাশের গাঁয়েই ওর শ্বশুরবাড়ি যে। তোমার মোটরটা নিয়ে কালই ওকে পৌঁছে দিয়ে আসব—”

বুঝলাম, ‘উতলা’ হওয়ার কথাটাও সর্বৈব মিথ্যে।

শীতলবাবুর বক্তৃতা শুধু যে শোনবার মতো তা নয় দেখবার মতোও। তিনি বক্তৃতা দিতে দিতে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করেন। তাঁর নিজের জীবনের ঘটনাবলীই তাঁর বক্তৃতার উৎস। তিনি প্রায়ই বক্তৃতা করেন, আজকাল ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে কোন লাভ নেই। লেখাপড়া শিখে আর ক'টাকা রোজগার করবে? দলে দলে বি-এ, এম্‌-এ, এম-বি ফ্যা-ফ্যা করে' রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কথাটা মিথ্যে নয়, শীতলবাবুর বলবার ভঙ্গীও ওজস্বিনী। কিন্তু তাঁর বক্তৃতাটা সার্থক হ'ত যদি তিনি নিজের ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে—আধুনিক ভাষায় যাকে বলে 'আপ্রাণ' চেষ্টা—তা না করতেন। চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁর চারটি ছেলেই বখা হয়েছে, নানারকম শৌখিন বেশভূষা করে' পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা মেরে বেড়ানোই তাদের কাজ। যাদের ছেলেরা লেখাপড়ায় ভালো শীতলবাবু সাধারণতঃ তাদেরই শুনিয়ে শুনিয়ে উক্ত বক্তৃতা অঙ্গভঙ্গী সহকারে করে' থাকেন। তাঁর নিজের পুত্রবধূ সুন্দরী হয়নি, তাঁর বন্ধু বগলাবাবুর পুত্রবধূটি হয়েছে। শীতলবাবু বগলাবাবুকে বলেছিলেন—বউ সুন্দরী হ'য়ে কি তোমার চারটে হাত-পা বেরিয়েছে? বউ সুন্দরী হওয়া ভালো নয়। পাঁচজনে নজর দেবে, বখা ছেলেরা বাড়িতে উৎপাত করবে। বগলাবাবু বন্ধুকে চিনতেন, মুচকি হেসে চলে' গেলেন। তিনি চলে' যাবার পর শীতলবাবু বললেন—সুন্দরী না হাতী! ঢিবির মতো কপাল, ছোট ছোট চোখ, মুখের হাঁ ইয়া বড়! অঙ্গভঙ্গী করে' দেখালেন সব।

আধুনিক বাংলা উপন্যাস পড়লাম সেদিন একখানা। ইনিয়ে বিনিয়ে কেবল মেয়েমানুষের কথা। কেবল Sex, Sex আর Sex—ও

ছাড়া অন্য প্রসঙ্গই নেই। ওই কথাই নানা রঙে ফেনিয়ে নানা ঢঙে বলবার চেষ্টা করেছেন ভদ্রলোক। আমার মনে হ'ল ভদ্রলোক Sex-starved : মনে হ'ল গল্পলেখার ছুতোয় তারিয়ে তারিয়ে কাম-রসটা নিজেই তিনি যেন উপভোগ করেছেন। অপরের পক্ষে যা বীভৎস ও ন্যক্কারজনক তাঁর পক্ষে তাই স্বাভাবিক। আমি ক্ষুধার্ত্ত লোককে নর্দমা থেকে ভাত তুলে তুলে খেতে দেখেছি। কোনও নৈতিক বক্তৃতা দিয়ে এদের সংশোধন করা যাবে না। আসল কারণটা সম্ভবতঃ অর্থনৈতিক। জীবনকে ভোগ করবার সামর্থ্য নেই, কিন্তু লোভ আছে প্রচুর।

কাল রাত্রে আমার জীবনে একটি মহা লাভ হয়েছে। পরম প্রাপ্তি। একটি অকৃত্রিম ভক্তের দেখা পেয়েছি। কৃত্রিম ভক্ত জীবনে অনেক জুটেছে। বস্তুতঃ তাদের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে আছি। তাঁরা যখন আমার প্রশংসার তোড়ে আমাকে বিপর্যস্ত করে' ফেলেন তখন মনে হয় যেন মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা-ধোওয়া হোজ্ পাইপের সামনে পড়ে' নাকানি-চোবানি খাচ্ছি।

কারো মুখের সামনে তার অজস্র প্রশংসা করা যে নিন্দা করার চেয়েও বেশী অশোভন এবং গর্হিত এ জ্ঞান অনেকের থাকে না। থাকে না, কারণ তাঁরা প্রশংসা করেন কোনও মতলবের তাগিদে। মতলবের তাড়ায় মানুষের শোভন-অশোভন জ্ঞান লোপ পায়। তাঁরা তখন বানরকে কন্দর্পকান্তি এবং ভীরু দুর্বলকে বীরেন্দ্র বলতেও ইতস্ততঃ করেন না। আমার জীবনে এরকম মতলববাজ লোকের দেখা অনেক পেয়েছি।

কিন্তু কাল রাত্রে যে লোকটি বৃষ্টিতে ভিজে রাত বারোটায়

স্টেশনে আমার জন্য দাঁড়িয়েছিল সে অন্য জাতের। আমি কাল রাত্রে সপরিবারে প্রচুর মাল-পত্র নিয়ে ক'লকাতা থেকে ফিরেছি। আমার ড্রাইভারকে এবং চাপরাসীকে খবর দেওয়া ছিল, কিন্তু তারা কেউ স্টেশনে আসে নি। এসেছিল ওই লোকটি। জিতু জেলে। বাজারে মাছ বিক্রি করে। হাসপাতালে অনেকদিন আগে তার এক যক্ষ্মাগ্রস্ত আত্মীয়কে নিয়ে এসেছিল, আমি তাকে স্যানাটোরিয়মে পাঠাবার ব্যবস্থা করে' দিই। কর্তব্য হিসাবেই করেছিলাম, কোনও প্রতিদান প্রত্যাশা করি নি। কথাটা মনেও ছিল না আমার। স্টেশনে গাড়ি থামতেই জিতু এগিয়ে এল, আমি প্রথমটা চিনতেই পারি নি তাকে। তার মাথায় পাগড়ি বাঁধা ছিল। আমাকে প্রণাম করে' বললে সে তার সেই আত্মীয়টির খবর দিতে আমার বাসায় আজ গিয়েছিল। গিয়ে দেখল ড্রাইভার আলী মদ খেয়ে বেহোঁশ হ'য়ে পড়ে আছে, আমার চাপরাসী শিউরামের জ্বর হয়েছে খুব। সে-ও প্রায় বেহোঁশ। জিতু ঝড় জল মাথায় করে' নিজে তাই স্টেশনে এসেছে যাতে আমার কোনও কষ্ট না হয়। কুলি ডেকে আনলে, নিজেও কয়েকটা জিনিস নাবালে, একটা গাড়ি আগে থাকতেই ঠিক করে' রেখেছিল। জিতুর মুখভাবে একটা অসাধারণ ভাব ফুটে উঠেছে দেখলাম। অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধার আলোকে তার চোখমুখ প্রদীপ্ত। মুগ্ধ হলাম।

মুগ্ধ হলাম বললেও সবটা ঠিক বলা হয় না, বলতে হয় কৃতার্থ হলাম। তারপরেই বিস্মিত হলাম মনে মনে। আমার মধ্যে কি এমন আছে যা দেখে ও এমন ভক্তি-গদগদ হ'য়ে পড়েছে। আমি তো অতি সামান্য লোক। ওর ভক্তিভাজন হবার যোগ্যতা কি আছে আমার? পুরাণের সেই গল্পটা মনে পড়ল। এক ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকে বাড়ি ফিরেছে। গুরু তাকে সংসার আশ্রমে

প্রবেশ করবার অনুমতি দিয়েছেন। ছেলেটি বাড়িতে এসে কপাটে ধাক্কা দিতেই তার মা কপাট খুলে দিলেন। ছেলে মা-কে প্রণাম করল। তারপর জিজ্ঞাসা করল—বাবা কোথায়? মা বললেন, ভিতরে আছেন, এস। ভিতরে এসে কিন্তু তার বাবাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। শুধু দেখা গেল খিড়কির দুয়ারটি খোলা রয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আর পাওয়া গেল না তাঁকে। তিনি ফিরলেন এক বছর পরে।

ছেলে জিজ্ঞাসা করল, "বাবা তুমি কোথায় চলে' গিয়েছিলে?"

বাবা উত্তর দিলেন, "বনে। তপস্যা করবার জন্যে।"

বিস্মিত হ'য়ে গেল ছেলে। প্রশ্ন করল—"হঠাৎ এ ইচ্ছা হ'ল কেন?"

বাবা উত্তর দিলেন—"তুমি যখন ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে ফিরে এসে তোমার মাকে প্রণাম করছিলে তখন আমি তোমাকে উঠোন থেকে দেখতে পেয়েছিলাম। দেখেছিলাম তোমার ললাটে তপস্যা-লব্ধ জ্যোতি জ্বলজ্বল করছে। দেখে আমার মনে হ'ল—আমি কি ওর প্রণাম নেবার যোগ্য? সংসারের সংঘর্ষে আমার চরিত্র যে মলিন হ'য়ে গেছে! তাই আমি খিড়কির দরজা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বনে চলে' গিয়েছিলাম তপস্যা করতে, মলিন চরিত্রকে উজ্জ্বল করতে। এক বৎসর অধ্যবসায়ের ফলে আমার সে সাধনা সিদ্ধ হয়েছে। এখন তুমি আমাকে প্রণাম করতে পার।"

আমার মনে হচ্ছে আমি কি জিতু জেলের ভক্তি-ভাজন হবার উপযুক্ত? আর একটা কথাও মনে হচ্ছে, ও যদি জেলে না হ'য়ে কালচার্ড ভদ্রলোক হ'ত তাহলে কি রাতদুপুরে বৃষ্টিতে ভিজে সামান্য উপকারের ঋণ শোধ করবার জন্য আসত? আমার বিশ্বাস আসত না। আজকাল 'কালচার্ড' মানেই স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক।

কানাই মাড়োয়ারির ব্যবহারে সেদিন হৃদয়ঙ্গম করলুম কেন ওরা ব্যবসায়ী হিসাবে এত উন্নত। আমার এক ভাইঝি প্রসব হবার জন্য আমার কাছে এসেছিল। হাসপাতালের নার্স লুইসাকে সেজন্য মেহনত করতে হয়েছিল খুব। উপর্যুপরি দু' দিন রাত জেগেছিল, প্রায় এক মাস রোজ দু'বার করে' এসে 'ড্রেস' করে' দিয়ে গিয়েছিল। অন্য কোন জায়গায় হ'লে অন্ততঃ সে দেড়শ' টাকা রোজগার করত। কিন্তু আমার কাছে 'ফী' চাইতে পারে না। তাই ঠিক করলুম ওকে একখানা ভালো শাড়ি কিনে দেব। কানাই মাড়োয়ারির দোকান থেকে ভালো শাড়ি নিয়ে এলাম একখানা। হালকা হলুদ রঙের শাড়ি। মনু বললে—কাল ষেটেরা পূজো। কালই ওকে দিও শাড়িখানা। সন্ধ্যের সময় লুইসা এলে তাকে দেখানো হ'ল শাড়িটা। রং পছন্দ হয়েছে কিনা। লুইসা দক্ষিণ-বাসিনী। খ্রীষ্টধর্ম বরণ করেছে বটে, কিন্তু তামিল রক্ত ওর ধমনীতে বহমান। লুইসা হেসে বললে—আমার ডগমগে'গাঢ় রং পছন্দ। 'I prefer deep colour !'

তার পরদিন ভোরে উঠেই গেলাম কানাইয়ের দোকানে। কানাই বললে—আজ রবিবার, আমার দোকান বন্ধ। আর আমার সেল্‌স্‌ম্যান মহাদেবের কাছে দোকানের চাবি থাকে। তার বাড়ি মাইল দুই দূরে। কাল যদি শাড়িখানা বদলে দি, হবে না ? বললাম, কিন্তু আজ যে ষেটেরা পূজো। ওই সঙ্গেই শাড়ি দেওয়া নিয়ম আমার স্ত্রী বলছে। বেশ, তোমার যদি অসুবিধা হয়, কালই বদলে দিও। শাড়িটা তার কাছে রেখে এলাম।

ঘণ্টা দুই পরে দেখি মহাদেব রিক্‌শা করে' এসে হাজির। রিক্‌শায় প্রকাণ্ড একটা কাপড়ের বস্তা। মহাদেব বললে—কানাই নিজে সাইকেল করে' আমার বাড়ি গিয়েছিল, তার কথামতো আমি ব্যাঙ্গালোর শাড়ি দোকানে যতগুলো ছিল সব আপনার কাছে নিয়ে

এসেছি। আপনার যে রংটা পছন্দ বেছে নিন। কানাইয়ের ব্যবহারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম।

এ কাহিনীর আর একটা চমৎকার ভাষ্য করেছেন আমার বাঙালী বন্ধুরা। হাসপাতালের যুবতী নার্স লুইসার শাড়ির জন্য আমি দোকানে ছুটোছুটি করছি—এর একটি অর্থ ই তাঁদের চিত্তে প্রতিভাত হয়েছে এবং সেটা তাঁরা ফুসফুস গুজগুজ করে' আলোচনা করেছেন!

বাংলার বাইরে এই শহরে কিছুদিন থেকে এসেছি। এখানকার যে বাঙালী সমাজ নিজেদের 'প্রবাসী' বলে' চিহ্নিত করে' রেখেছেন তাঁদের দুরবস্থা দেখলে সত্যিই বড় হতাশ হ'য়ে পড়তে হয়।

এককালে বাংলা দেশের কৃতী-সন্তানরা এখানে এসে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিজেদের। সকলে তাঁদের খাতির করত, তাঁরা খাতিরের উপযুক্তও ছিলেন। তাঁরা অর্থোপার্জন করেছিলেন প্রচুর, এখানকার জনহিতকর কাজে ব্যয়ও করেছেন প্রচুর। এখানকার স্কুল, হাসপাতাল, কলেজ তাঁদের নামের সঙ্গে জড়িত। তাঁদের নিজেদেরও প্রত্যেকের প্রাসাদোপম বাড়ি আছে এখানে। জমিজমাও আছে। জমিদারিও ছিল কারো কারো।

কিন্তু তাঁদের বংশধরদের দেখে হতাশ হ'তে হয়। গরুড়ের বংশে এরকম চামচিকেদের জন্ম হ'ল কি করে'! ছেলেদের মধ্যে অধিকাংশই লেখাপড়ায় খুব খারাপ। সবই প্রায় থার্ড ডিভিসন। গুণ্ডামিও করতে পারে না ভাল করে', ছোঁচামি করে। প্রতি বাড়িতেই বড় বড় মেয়ে, অনেকেরই বিয়ে হয় নি, অনেকেই ব্যভিচারিণী হ'য়ে পড়েছে, অনেক সময় প্রকাশ্যেও। এদের

দুর্গাপূজায় তিন চারটে দল, লাইব্রেরীও একাধিক, কোনটাই ভালোভাবে চলে না, প্রত্যেকটাতেই দলাদলি আর ঘোঁট। ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথ এদেশে জন্মেছিলেন তাই তাঁর নামে 'জয়ন্তী' মাঝে মাঝে হয়। পঁচিশে বৈশাখটা তো একটা পর্বের মতো হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, যারা নিজেদের বাপ মায়ের জন্মদিন কবে তা জানে না, তারা কবির জন্ম-উৎসবে নাচতে, গাইতে বা বক্তৃতা করতে আসে। উৎসবের নামে কি যে প্রহসন হয় তা বোঝবার ক্ষমতাও এদের নেই। বিহারীদের নিন্দায় এরা পঞ্চমুখ। কিন্তু আমার মনে হয় মানুষ হিসাবে বিহারীরা এদের চেয়ে অনেক ভালো, অনেক বেশী ভদ্র।

বাঙালীর ছেলেরা চাকরি পায় না তার একটা বড় কারণ এখানকার অধিকাংশ বাঙালী ছেলেই চাকরি পওয়ার যোগ্য নয়। আমি অমুক বাবুর নাতি বা দৌহিত্র—এ বললে তো আর চাকরি মিলবে না। যোগ্য বাঙালীরা চাকরি পায় নি এরকম দৃষ্টান্তও আছে। এই নিয়ে অনেকে গলাবাজি করে' চীৎকার করেন। তাঁরা ভুলে যান যে চাকরির ক্ষেত্রে পৃথিবীর সর্বত্রই পক্ষপাতিত্ব আছে। নিজেদের লোককে সবাই চাকরি দিতে চায়। এরাও চায়।

এ বিষয়ে কিন্তু বাঙালীরা ব্যতিক্রম, বাঙালী বড় চাকুরেরা সাধারণতঃ বাঙালীদের প্রতি কোন অনুগ্রহ প্রকাশ করেন না— এইরূপ জনশ্রুতি। যোগ্য বাঙালী চাকুরি-প্রার্থী বাঙালী অফিসার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন এরকম একাধিক খবর আমি জানি। এত কথা লিখলাম মনের দুঃখে।

একটা খবর পেয়ে দুঃখটা নতুন করে' অনুভব করলাম। জগদীশবাবু মারা গেছেন। তিনি পোস্টাফিসে কাজ করতেন। অনেকদিন আগে রিটায়ার করেছেন। পাড়ার ছেলেরা আমার

কাছে চাঁদা চাইতে এসেছিল শবদাহের ব্যবস্থা করবার জন্যে। তাঁর পরিবার নাকি কপর্দকশূন্য।

অতীতের গর্ব আঁকড়ে ধরে' আমরা বেঁচে আছি ভবিষ্যতের আশায়, একথা অনেকে বলেন। কিন্তু সেটা কি সত্যি? একজন বাঙালীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন বাঙালীদের ইতিহাসের খবর সে রাখে কি না। দেখবেন কিচ্ছু রাখে না। নিজের বংশেরই পুরো খবর রাখে না। আস্ফালন করবার বেলায় কেবল বলে, আমাদের রবীন্দ্রনাথ, আমাদের বিবেকানন্দ, আমাদের অরবিন্দ। কিন্তু একটু চেপে ধরুন, দেখবেন রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-অরবিন্দের সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানে না সে। নামগুলো জানে শুধু। আর সেইগুলোকে মূলধন করে' মাঝে মাঝে নাচ-গান-বক্তৃতার মজলিস বসায় নিজেরে জাহির করবার জন্য। হায় ভগবান, কোথায় চলেছি আমরা? সমূলে ধ্বংস হওয়াটাই কি এ জাতির অনিবার্য পরিণাম?

কাল মনের দুঃখে বাঙালীদের সম্বন্ধে যা লিখেছিলাম আজ নিজেই তার প্রতিবাদ করেছি, কারণ আজ অরুণের সঙ্গে দেখা হয়েছে। অরুণ বসুকে আগে কখনও দেখিনি। তার মায়ের অসুখের জন্য আমাকে ডাকতে এসেছিল। পিতৃহীন অরুণ নিজের চেষ্টায় বড় হয়েছে। অর্থাভাবে লেখাপড়া বিশেষ হয়নি, কিন্তু সে মানুষ হয়েছে। পৈতৃক সম্পত্তি সে তিন বিঘে মাত্র জমি পেয়েছিল। একা নিজের হাতে চাষ করে' সে তিন বিঘে জমিতে শাকসব্জির বাগান করেছে। পৈত্রিক বাড়ি ছিল একখানা। কিন্তু মেরামতের অভাবে পড়ে' গিয়েছিল সেটা। অরুণ নিজের হাতে মাটির দেওয়াল দিয়ে ছোট বাড়ি করেছে আবার। চমৎকার তকতকে ঝকঝকে

বাড়ি। বাড়িটা তার বাগানের মধ্যেই। কারও সাহায্য না নিয়ে নিজের হাতে করেছে বাড়িখানা। বাড়িতে লোক বেশী নেই, সে আর তার মা। মাকে পরম সুখে রেখেছে দেখলাম। একটি গাই আছে, সেইটি নিয়ে থাকেন তিনি। দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম।

তার মায়ের ম্যালেরিয়া হয়েছে। একটু খারাপ ধরনের ম্যালেরিয়া, সারতে একটু সময় নেবে। আমি ফী নিতে চাই নি। কিন্তু অরুণ বললে, আপনি ফী না নিলে স্বস্তি পাব না। মনে হবে গরীব বলে' আপনি আমার উপর দয়া করলেন। কিন্তু আমি গরীব নই, আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স প্রায় আড়াইশো টাকা।

অরুণের মত ছেলে বাঙালী জাতির গৌরব। জানি না এরকম ছেলে বাঙালীদের মধ্যে আরও আছে কি না, যদি থাকে তাহলে বাঙালীরা আবার গৌরবের শিখরে আরোহণ করবে। অরুণ শহর থেকে অনেক দূরে থাকে বলে' তাকে চিনতাম না। শহরের তথাকথিত অভিজাত বাঙালীদের সঙ্গে তার নিজেরও কোন যোগাযোগ নেই।

এক রিকৃশাওলার মুখে এক ভদ্রলোকের কথা শুনলাম। যখন ফরসা জামা-কাপড় পরেন, ঘন ঘন সিগারেট খান, পুলিসে চাকরি করেন—তখন তাঁকে 'ভদ্রলোক' বলতেই হবে। কিন্তু মনে মনে ভাবছি—তাঁকে 'মাল বলব না 'চীজ্ (২) 'বলব, না স্যাম্পল বলব। কোন্‌টা ঠিক মানাবে ওই পুলিসপুঙ্গবকে? ঘটনাটা এই। পুলিস-অফিসারটি উক্ত রিকৃশাওলার রিকৃশায় চড়ে' প্রায়

মাইল দুই গেলেন দুপুর রোদে। গলদঘর্ম রিক্‌শাওলা কপালের ঘাম মুছে যখন ভাড়া চাইলে তখন অবাক হ'য়ে গেলেন।

ভাড়া! ভাড়া চাইছে তাঁর কাছে?

বললেন, "আমি কে চেন?"

"না হুজুর—"

"আমি দারোগা। তোমার রিক্‌শার নম্বর কত, দেখি। ও, ১৭৫। আচ্ছা। কত ভাড়া চাই তোমার—"

ঘাবড়ে গেল রিক্‌শাওলা। বললে, "মাপ করবেন, আমি চিনতে পারি নি। মেহেরবানি করে' আমার নামে রিপোর্ট করবেন না হুজুর।"

হুজুর বললেন, "কিন্তু তোমার নম্বরটা যে কাঁটার মতো বিঁধে গেল মনে। সে কি অমনিতে উঠবে?"

ফ্যালফ্যাল করে' চেয়ে রইল রিক্‌শাওলা।

"ও কাঁটা তুলতে হ'লে কিছু সেলামী লাগবে।"

"কত হুজুর—"

"অন্তত এক টাকা—"

টাকাটা দিয়ে সেলাম করলে রিক্‌শাওলা, তার পর ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

রিক্‌শাওলাটা আমার কাছে এসেছিল তার ছেলের ওষুধ নিতে।

"আমি আপনার পুরো ফী দিতে পারব না। কিছু মাপ করুন, পুলিসের জ্বালায় আমরা মারা যেতে বসেছি—"

বলে, ওই কাহিনীটি আমাকে বললে।

আমি বললাম, "তোমদের তো ইউনিয়ন আছে। তোমরা এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই পার—"

সে বললে, "ইউনিয়ন? ছিল বটে আগে একটা। এখন সেটা উঠে গেছে—"

"কেন—"

"আমরা চাঁদা দিয়ে যে টাকাটা জমিয়েছিলাম আমাদের প্রেসিডেন্ট সেটা মেরে দিয়ে সরে' পড়েছেন। শুনছি না কি বোম্বাই গেছেন।"

"কে ছিলেন প্রেসিডেন্ট?"

যার নাম করলে সে মোটেই শ্রমিক নয়, এক বড় লোকের বখা ছেলে।

ভাবছি—এই গরীবগুলোর উপায় কি তাহলে?

মনুর জ্বরটা কাল থেকে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। অর্থাৎ তাকে বিছানা নিতে হয়েছে।, অনেকদিন থেকেই না কি একটু একটু জ্বর রোজই হ'ত, আমার কাছে গোপন করে' ছিল। কেন করেছিল জানি না। মনুর স্বভাবের মধ্যে কেমন যেন একটা গোপনতা আছে। তার অন্তরলোকে আমার অবাধ গতি, কিন্তু তবু মনে হয় ওর নিজস্ব আর একটা জগৎ আছে যেখানে ও একাকিনী। অসুখে পড়ে' ও যেন অপ্রস্তুত হয়ে' পড়েছে। অপরাধী ধরা পড়ে' গেলে যেমন হয়, অনেকটা তেমনি। আজবলাল আমার চেয়েও বেশী ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। চিরঞ্জীব আর মালতীকে টেলিগ্রাম করলুম। ওরা এখানে এসে থাকুক যতদিন না মনু সেরে উঠছে। সারতে দেরি হবে, টাইফয়েড বলে' মনে হচ্ছে।

আমার এক ভাগ্নে এসেছিল আমার কাছে। তার পরীক্ষা হ'য়ে গেছে, সে এসেছিল আমার কাছে একখানা চিঠি নিতে। চিঠি নিয়ে সে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবে চাকরির জন্য। বন্ধুটি ইচ্ছে করলে নাকি চাকরি জুটিয়ে দিতে পারে একটা। চিঠি-খানা নিয়েই সে চলে' গেল, মন্থুর অসুখের জন্য তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখলাম না। এসেই চলে' গেল। যেন পোস্টাফিসে চিঠি ফেলতে এসেছিল।...সোহাগকে আজ টেলিগ্রাম করলাম আসবার জন্য! মন্থুর টাইফয়েডই হয়েছে। আগেই আন্দাজ করেছিলাম। এখন রক্ত পরীক্ষা করে' নিঃসন্দেহ হয়েছি!

মন্থুর অসুখে বাড়িতে যেন একটা সাড়া পড়ে' গেছে। দু'বেলায় অন্ততঃ পঞ্চাশ কাপ চা হচ্ছে, বৈঠকখানায় বারান্দায় লোকের ভিড়। আমার সহকর্মী ডাক্তাররা সবাই আসছেন, তাছাড়া আসছেন এখানকার প্রতিবেশীরা। আমার রোগীর আত্মীয়-স্বজনের ভিড়ও কম নয়, তারা সবাই রোজ খবর নিতে আসে। এরা গরীব, এরা অনাত্মীয়, কিন্তু এদের উৎকণ্ঠা দেখে মনে হয় এদের চেয়ে বড় আত্মীয় আমার আর কেউ নেই। আমার রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়েরা এখনও কেউ আসেননি। দু'চারজন পোস্টকার্ড-যোগে খবর নিতে চেষ্টা করেছেন। আমি বড় ভীত হ'য়ে পড়েছি। সোহাগ দিনরাত কাঁদছে। মন্থুর জ্ঞান নাই।

মন্থুর অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপের দিকে যাচ্ছে। ক'লকাতার একজন বড় ডাক্তারকে আসবার জন্য 'তার' করেছি। এর মধ্যেও

'কলে' বেরুতে হয়েছে আমাকে। রোগীদের বাড়ির বিপদের দিকটাও তুচ্ছ করতে পারি না। তিনটে টাইফয়েড রুগী আমার চিকিৎসায় আছে। আমার উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস। সুতরাং আমাকে যেতেই হচ্ছে।

আবার এই সব করুণ রসের মধ্যেও হাস্যরসের খোরাক পেয়ে যাচ্ছি মাঝে মাঝে। মহাকাল যেন জীবন-মরণের একঘেয়েমি নষ্ট করবার জন্যে মাঝে মাঝে চাটনির ব্যবস্থা করছেন।

একটি বাড়ির কর্তা টাইফয়েডে মরণাপন্ন হ'য়ে আছেন। আজ তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখি একটি লোক বাইরের বারান্দায় বসে' হাউ হাউ করে' কাঁদছে। লোকটির এক মুখ কাঁচা-পাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, ভুরুও কাঁচা-পাকা, ভুরু দুটি ঝুলে পড়েছে চোখের উপর। চোখের জলে নাকের জলে এই মুখ পরিপ্লাবিত। আমি ভাবলুম কোন আত্মীয় বুঝি। পরে জানতে পেরেছি, আত্মীয় নয় —পাওনাদার। যিনি রুগী তিনি অসুখে পড়বার ঠিক আগেই ওর কাছ থেকে চড়া সুদে হাজার তিনেক টাকা ধার নিয়েছিলেন। বলেছিলেন হ্যাণ্ডনোটটা কাল লিখে দেব। কিন্তু সেইদিন রাত্রেই তিনি জ্বরে পড়েন, আর লিখতে পারেন নি!

কুলগুরু এসেছেন। তিনি দক্ষিণাকালীর পূজা করছেন। তারস্বরে পাঠ করছেন দক্ষিণাকালীর স্তব। "করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং" যদি দয়া করে' মনুকে ফিরিয়ে দেন। বলিদানের ছাগ-শিশুটা আর্তরব করছে। পূজার হট্টগোল ঘণ্টা-কাঁসরে প্রকম্পিত হচ্ছে বাড়িটা। এত গোলমাল আমি কখনও বরদাস্ত করতে পারি না। কিন্তু এখন করছি। কিছু অস্বাভাবিক

মনে হচ্ছে না। একটি কথাই কেবল মনে কাঁটার মতো বিঁধে আছে—মনুর জীবন-সংশয়—হেমারেজ হচ্ছে। যে কোনও উপায়ে হোক ওকে বাঁচাতেই হবে তা সে উপায় যতই হাস্যকর, যতই অদ্ভুত হোক না কেন। এই আগ্রহের কাছে সমস্ত যুক্তি মাথা নত করেছে।

ক'লকাতায় যে ডাক্তারকে টেলিগ্রাম করেছিলাম তিনি দুঃখিত হ'য়ে টেলিগ্রাম করেছেন যে সাতদিনের আগে আসতে পারবেন না। হেভিলি এন্‌গেজ্‌ড্‌! ওর সঙ্গে একসঙ্গে পড়েছিলাম আমি। আমার চেয়ে ও সব বিষয়েই খারাপ ছিল। ফেল করেছিল দুবার। কিন্তু তার বাবা ছিলেন ক'লকাতার একজন যশস্বী ডাক্তার। টাকার অভাব ছিল না। ছেলেকে বিলেত পাঠালেন এবং সেখানে সে বারকয়েক ফেল করে' অবশেষে একটা বিলিতী ডিগ্রি নিয়ে এল। এসে বসতে লাগল বাবারই ডিসপেন্সারিতে। বছর দশেক সেখানে টিকে রইল কোনক্রমে। তারপর তার প্র্যাকটিস জমল। দশ বছর পরে ক'লকাতার রুগীরা বুঝতে পারল ও একজন দিগ্‌গজ ডাক্তার। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় এই যে আমারও ধারণা হ'ল ও সত্যিই বড় ডাক্তার। মনে হ'ল মনুর চিকিৎসা ও আমার চেয়ে ভাল করে' করতে পারবে! টাকার জোরে বারাঙ্গনারাও আজকাল 'দেবী', তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরাও প্রথম শ্রেণীর প্রথম সারে দেদীপ্যমান। টাকার জৌলুস সকলেরই বুদ্ধিভ্রংশ করে' দেয়।

আমি ভাবিতাম আমার বুদ্ধি এসব মেকি জিনিসে অভিভূত হয় না। কিন্তু এখন দেখছি হয়। এখন মনে হচ্ছে কোন্‌টা মেকি কোন্‌টা খাঁটি তা ধরাও শক্ত। হাঁসেদের মধ্যে কোনও বক যদি দীর্ঘকাল বাস করতে পারে তাহলে সবাই তাকেও হাঁসের মর্যাদা

দেবে—হাঁসেরা না দিক মানুষেরা দেবে। অদ্ভুত জীব এই সামাজিক মানুষরা!

আজবলালকে আর সামলানো যাচ্ছে না। সে মাথা খুঁড়ছে, চুল ছিঁড়ছে, পাগলের মতো হ'য়ে গেছে। সোহাগের ফিট হচ্ছে বারবার। একমাত্র মালতীই দৃঢ়হস্তে এই বিপর্যস্ত নৌকোটার হাল ধরে' বসে' আছে। চিরঞ্জীব নির্বাক হ'য়ে গেছে। আমার অবস্থা অবর্ণনীয়। মনু কাল চলে' গেছে।

দিন কয়েক হ'ল বদলি হ'য়ে এসেছি। বদলি হওয়ার যে কি ঝঞ্ঝাট তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। গভর্নমেণ্টের বাড়ি, গভর্নমেণ্টের চাকর-চাপরাসী, যাওয়ার খরচও গভর্নমেণ্টের, কিন্তু তবু মনে হয় যেন কি একটা লোকসান হচ্ছে। অর্থের দিক থেকে লোকসান হয় না, কারণ মাইনে যা পাবার ঠিক পাই, নতুন জায়গায় কলও অনেক আসে। কিন্তু তবু মনে হয় লোকসান হ'ল। মনে হয় পুরোনো জায়গায় আমার কিছুটা অংশ যেন ফেলে এলাম, তা আর উদ্ধার করা যাবে না, হারিয়ে যাবে।

এখানে এসে ক'দিন খুব ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। আমার আগে যিনি ছিলেন তিনি অসুস্থ হ'য়ে আমার বাড়িতেই রইলেন ক'দিন। তাঁর কলগুলো আমাকে সামলাতে হ'ল। আফিসের কাজকর্মও অগোছালো অবস্থায় পেয়েছি, ঠিক করে' নিতে হচ্ছে সেগুলো। হাসপাতালে সার্জিকাল কেসের ভিড় খুব। তিন চারটে বড় অপারেশন রোজই করতে হয়। তাছাড়া পুলিস কেস আর পোস্টমর্টেম।

কাল একটা পোস্টমর্টেম করে' মন বিকল হ'য়ে গেছে। মানুষ এত নিষ্ঠুর হ'তে পারে? বিশেষ করে' মেয়েমানুষ? সতীনের ছেলের মাথায় হাতুড়ি ঠুকে তাকে মেরে ফেলেছে একটা উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে। ছেলেটার বয়স মাত্র দশ বছর। মেয়ের আত্মীয়-স্বজনেরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করছে যে মেয়েটা পাগল। তাই ওকে under observation রেখেছি। আমার পাগল বলে মনে হয় না। খাচ্ছে দাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে। দেখে মনে হয় খুব নিশ্চিন্ত ঘুম। যেন ও জীবনের একটিমাত্র কর্তব্য শেষ করে' এবার স্বাস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। এর পর যাই হোক ও তার তোয়াক্কা করে না।

হঠাৎ মনে হ'ল প্রায় সাত দিন মনুর কথা একবারও মনে পড়ে নি। কাজের তোড়ে ওই স্মৃতির রঙীন পালকটা ভেসে চলে' গেল না কি! লজ্জিত হলাম।

জিতু জেলে ক'দিন আগে এসেছে একটি রোগী নিয়ে। অতদূর থেকে ট্রেনভাড়া খরচ করে' এসেছে। বিনা পয়সার রোগী নয়, আমাকে রীতিমত ফী দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছে। এখানে একটা ঘর ভাড়া করেছে।

জিতুকে বললাম—"ওর চিকিৎসা তো ওখানেই হ'তে পারত। এখানে ওকে এত খরচ করিয়ে নিয়ে এলে কেন!"

জিতু বললে—"আপনার উপর আমাদের বিশ্বাস বেশী। অন্য কোথাও চিকিৎসা করিয়ে ভরসা হয় না।"

মালতী বলছিল জিতু প্রায়ই বাড়ির ভিতরে এসে কাঁদে। মনুর জন্য। আমার সামনে কিন্তু সে শোক প্রকাশ করে নি একদিনও। মালতীর কাছে প্রকাশ করেছে লুকিয়ে। মালতীকে বলেওছে আমাকে

একথা যেন না জানানো হয়। আমার মনে তাহলে দুঃখ হবে। মালতী কিন্তু কথাটি আমাকে বলে' দিয়েছে।

ডায়াবিটিস্ সম্বন্ধে একজন ডাক্তার গড়গড় করে' অনেক নূতন কথা বলে' আমাকে সেদিন তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এত কথা আমি জানতাম না। নবতম সংস্করণের যে বইটা কিছুদিন আগে কিনেছি তাতেও এসব কথা নেই। শ্রদ্ধা হ'ল ডাক্তারটির উপর। দিন দুই পরে শ্রদ্ধা কিন্তু আর রইল না। আমার নামেও বিদেশী এক কোম্পানির বিজ্ঞাপনের প্যামফ্লেটটা এল। তাতে দেখলাম ওই সব কথাই লেখা আছে। গান্ধিজীর সেই কথাটা মনে পড়ল—এখানকার ডাক্তাররা বিদেশী ঔষধ ব্যবসায়ীদের দালাল মাত্র।

একথা অবশ্য সত্য যে বিদেশীরাই চিকিৎসাশাস্ত্রে বহুরকম গবেষণা করছেন, তাঁদের গবেষণা ডাক্তারি শাস্ত্রে সত্য বলে' স্বীকৃতও হচ্ছে, কিন্তু একথাও সমান সত্য যে আমরা মাছি-মারা কেরানীর দল, বিদেশী প্যামফ্লেটে যা কিছু লেখা থাকে তা নির্বিচারে সত্য বলে' বিশ্বাস করি এবং রোগীদের তা কিনতে বাধ্য করি। অনেক সময় রোগীরা এতে সর্বস্বান্ত হ'য়ে যায়। কিন্তু আমাদের সেদিকে লক্ষ্য থাকে না। আমরা আপ-টু-ডেট চিকিৎসা করে' গর্ব অনুভব করি।

একটা আশ্চর্য লোক দেখলাম আজ। 'কল' থেকে ফিরছিলাম। এমন সময় টক্ করে' একটা পাথর এসে আমার গাড়িতে লাগল। আর একটু হ'লে জানলার কাচ ভেঙে যেত। গাড়ি থামালাম। দেখি কালো লম্বা শুঁটকো একটা লোক প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

গোঁফ দাড়ি মাথার চুল লম্বা লম্বা, অনেকদিন তেল পড়েনি বলে' কটা হ'য়ে গেছে। কোমরে একটা ন্যাকড়া জড়ানো। উরুর অর্ধেকও ঢাকা পড়ে নি তাতে। আমার ড্রাইভার আলী নেমে গিয়ে তাকে জিগ্যেস করলে কেন সে ঢিল ছুঁড়েছিল।

সে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। কেবল তার গোঁফের জঙ্গলে একটা শিহরণ বয়ে' গেল দেখ্‌লুম। তার চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হ'ল ক্ষমতা থাকলে আমার মোটরটাকে সে ভস্মীভূত করে' দিত। কিন্তু কোন কথা বললে না সে।

পাড়াগাঁয়ের রাস্তায় মোটর দাঁড়ালেই ছেলের দল এসে দাঁড়ায় আশেপাশে। তাদের একজন বললে—ও লোকটা চিড়ি-মার। চিড়িয়া অর্থাৎ পাখী মারে। তীর দিয়ে বা বন্দুক দিয়ে নয়। ঢিল ছুঁড়ে। গুলতি দিয়ে ঢিল ছোঁড়ে না, হাত দিয়ে ছোঁড়ে। হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ। চড়ুই, শালিক, কাক, বক—যা সামনে পায় তাই মারে। মেরে পুড়িয়ে খায়। এক জায়গায় দেখলাম কতকগুলো ইঁট স্তূপীকৃত করা রয়েছে। আর তার কাছেই পোড়াবার সরঞ্জাম। দু'খানা দাঁড়-করানো ইঁটের মাঝখানে কয়লা। কয়লা সে কেনে নি, শুকনো ডালপালা পুড়িয়ে করেছে।

সুসভ্য বিংশ শতাব্দীতে প্রাগৈতিহাসিক বন্যযুগের নমুনা দেখে বিস্মিত হলাম।

কাল মনুর বার্ষিক শ্রাদ্ধ হ'য়ে গেল। আত্মীয়স্বজনরা কেউ আসে নি।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল এদেশের লোকেরা, যাদের আমরা মূর্খ ছোটলোক বলি, তারা আত্মীয়ের আত্মীয়েরও মৃত্যু হ'লে সবাই মাথা

কামায়। গ্রামসম্পর্কের মৃত আত্মীয়দেরও সম্মান জানায় এই ভাবে। আমরা সভ্য কিনা, ওদের কাণ্ড দেখে হাসি। এমন বাঙালী বাবুরও খবর জানি যিনি মায়ের মৃত্যুতেও মাথা কামান নি। পুরোহিতকে মূল্য ধরে' দিয়েছেন। স্যুটের সঙ্গে ন্যাড়া মাথা নাকি নিতান্ত বেমানান। সুরুচিতে বাধে।

মনুর শ্রাদ্ধে একটি পেশাদার লোভী পুরোহিতকে ডেকে কাজ করালাম এবং দ্বাদশজন ব্রাহ্মণ নামধেয় অব্রাহ্মণকে ভোজন করালাম এবং তথাকথিত বন্ধুবান্ধব, যাদের পোলাও মাংস খাইয়ে শতাধিক টাকা ব্যয় করলাম তাঁরা কেউই আমার বন্ধু নন। মনে পড়ল মনু একটা পা-কাটা খোঁড়াকে খাওয়াতে খুব ভালবাসত। কিন্তু সে তো থাকে একশ' মাইল দূরে!

চাপরাসীকে বললাম—শহরে যত খোঁড়া ভিখারী আছে ডেকে নিয়ে এস। তাদের খাওয়াব।

চাপরাসী ফিরে এসে বললে খোঁড়া ভিখারী একটাও নেই। কানা আর নুলো আছে।

কম্পাউণ্ডার শোভনলাল বললে শিবমন্দিরে এক খোঁড়া সাধু থাকে। বলেন তো তাকে ডেকে আনি।

বললাম, আনো। একটু পরেই আবক্ষদাড়ি এক লাল সন্ন্যাসী ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে এসে হাজির। মনে হ'ল সোবিয়েত রাশিয়া থেকে এল নাকি। কারণ তার সব লাল। দাড়ি লাল, মাথায় পাগড়ি লাল, জামা জুতো এমন কি ছাতা পর্যন্ত লাল। সে বললে সে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খাবে না, তার গুরুজির বারণ আছে। তবে আমি যদি তাকে কিছু টাকা দি তাহলে সে শিউজির ভোগ চড়িয়ে প্রসাদ পেতে পারে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কত টাকা চাই?

সে আমার পিছন দিকে চেয়ে বললে, দশ টাকা। আমিও সঙ্গে

সঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম শোভনলাল ছু'হাতে দশটা আঙুল তাকে দেখাচ্ছে। দূর করে' দিলাম লোকটাকে। জিতু জেলেকে আজ দশ টাকা পাঠিয়ে দেব মন্থর সেই খোঁড়াকে ভাল করে' খাইয়ে দেবার জন্য।

তৃপ্তি-অতৃপ্তির রহস্য ভেদ করা শক্ত। কাল মালতী সামান্য বেগুন বড়ি আর উচ্ছে দিয়ে সুকতো রেঁধেছিল। এত ভাল লেগেছিল। আজ সেই মালতীই অনেক রকম মসলা দিয়ে মাংসের কোর্মা রেঁধেছে, রান্না ভালই হয়েছে, চিরঞ্জীব তো বললে চমৎকার, কিন্তু খেয়ে আমার তেমন তৃপ্তি হ'ল না। কালকের শুক্তোটাই বেশী ভাল লেগেছিল। অথচ আগে এই মালতীরই রান্না কোর্মা কত তারিফ করে' খেয়েছি।

মালতীর রান্না ঠিক আছে। আমিই বদলাচ্ছি। ওস্তাদী গানের চেয়ে সাদাসিধে রামপ্রসাদী গানই বেশী ভাল লাগে আজকাল।

কম্পাউণ্ডার শোভনলাল আজ চুরির দায়ে ধরা পড়েছে। এক পাউণ্ড কুইনিন সরিয়েছিল। যে বাড়ি থেকে কুইনিন উদ্ধার হয়েছে সকলের ধারণা ছিল সেটা ওরই বাড়ি এবং বাড়ির কর্ত্রী ওর বউ। এখন শুনছি অন্যরকম। বাড়িটি বেশ্যাবাড়ি এবং ওই মেয়েটি ওর রক্ষিতা। আরও শুনছি হাসপাতালের সাব-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জনটি— যিনি চন্দনফোঁটায় চিতেবাঘটি সেজে রোজ হাসপাতালে আসেন তিনি নাকি ওর প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনিই পুলিসে খবর দিয়ে শোভনলালকে এই খপ্পরে ফেলেছেন।

আমি পক্ষপাতহীন থাকবার চেষ্টা করছি কিন্তু আমার মনে মনে ইচ্ছেটা শোভনলাল ছাড়া পাক আর ওই চিতেবাঘটা ফাঁদে পড়ুক।

এরকম অবৈধ ইচ্ছে মনে জাগা উচিত নয়, কিন্তু জাগছে। বাইরে কিন্তু একটা ন্যায়পরতার মুখোশ পরে' আছি। আশ্চর্য!

দুর্গাপুরের দিকে যাচ্ছিলাম। রাস্তায় গাড়ির টায়ার ফাটল। আলী বললে, "কুছ্ ফিকির নেই করিয়ে হুজুর। আভি হাম সব ঠিক কর দেঁতে হেঁ। স্টেপ্‌নি ঠিক হ্যায়।"

কিন্তু দেখা গেল স্টেপ্‌নিও ঠিক নেই। এতেও দমল না আলী। বললে—"কুছ্ ফিকির নেই হুজুর, আভি বানা লেঙ্গে। আপ পেড়কা ঠাণ্ডে মে মজেসে বৈঠ যাইয়ে—"

কাছেই একটা প্রকাণ্ড গাছের ছায়া ছিল। আলী সেখানে আমার বিছানা করে' দিলে একটা। আমি ছায়ায় বসে' বসে' তার চাকা-বদলানো দেখতে লাগলাম।

চাকা-বদলানো কাজটা নিতান্ত সহজ নয়। প্রথমে সে স্টেপ্‌নির ভিতর থেকে টিউবটা বার করলে। তারপর যেখানে-যেখানে ছ্যাঁদা হয়েছে সেগুলো সলিউশন দিয়ে জুড়ে আবার টিউবটাকে তার ভিতরে পুরে পাম্প করতে লাগল। পাম্প হ'য়ে গেলে সে বেরুলো ইঁট খুঁজতে। কাছে-পিঠে কোথাও ইঁট ছিল না। সে জঙ্গলের মধ্যে চলে' গেল। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। তপ্ত 'লু' বইছে। আলী নির্বিকার। জঙ্গল থেকে খুঁজে ইঁট নিয়ে এল। তারপর 'জক্' ফিট করে' ফাটা টায়ারটা বার করলে। সেটাকে সরিয়ে দিয়ে স্টেপ্‌নিটা ফিট্ করতে লাগল।

আমি আলীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। রোগা লোকটা, বয়স হয়েছে, মুখে জরার চিহ্ন স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে! ওর জীবনচরিতও কিছু কিছু জানি। ও সব রকম কাজ করেছে। রিক্‌শা চালিয়েছে,

টমটম চালিয়েছে, একটা ঘোড়া-গাড়ির কোচোয়ানও ছিল কিছুদিন, মুটেগিরি পর্যন্ত করেছে। বহু জায়গায় ঘুরেছে। বহু মনিবের কাছে মোটরের ড্রাইভারি করেছে। মিলিটারিতে ছিল, দেশ-বিদেশও ঘুরেছে অনেক। হঠাৎ মনে হ'ল অ্যাব্রাহাম্ লিংকনের মতোই ওর জীবন। কিন্তু ও অ্যাব্রাহাম্ লিংকন হয় নি। কেন? ওর দুটো সাংঘাতিক দোষের কথা জানি। প্রথমতঃ, ভয়ানক মিথ্যে কথা বলে। দ্বিতীয়তঃ, সুযোগ পেলেই মদ খায়। চাকা ফিট্ করে' আলী বললে—"আইয়ে হুজুর, গাড়ি তৈয়ার হ্যায়।" গাড়িতে বসে' আলীকে জিগ্যেস করলাম—"আলী, তুম্ ঝুট্ বাত বোলা হ্যায়—"

"কভি নেহি হুজুর"

"কভু নেহি বোলো"

"বহুত খু"—

"দারু পিতে হো?"

"কভি নেহি হুজুর"

"কভি নেহি পিও"

"বহুত খু—"

হঠাৎ এই মিথ্যেবাদী মাতালটাকে ভাল লেগে গেল। অ্যাব্রাহাম্ লিংকনের চেয়েও!

এই পৃথিবীতেই কি স্বর্গ নরক আছে? মহাপ্রভু সিং এই জীবনেই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছে দেখতে পাচ্ছি। কিছুদিন আগে যখন জরিপ হয়েছিল তখন মহাপ্রভু সিং আমিনকে মোটা ঘুষ খাইয়ে গঙ্গার ধারের প্রায় তিন চার মাইল-ব্যাপী জমি নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছিল। তার মধ্যে অনেক বিধবার, অনেক নাবালকের, অনেক গরীব ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতের জমিও ছিল। জমির দখল নিয়ে মকদ্দমা করবার সামর্থ্য ছিল না বেচারীদের। তাদের নীরবে অশ্রুপাত করে' নিরস্ত হ'তে হয়েছিল। মহাপ্রভু সিং সাড়ম্বরে জমিগুলো ভোগ করছিল। গঙ্গার ধারে বিরাট বাড়ি করিয়েছিল, বাড়ির চারদিকে চমৎকার বাগান। শোনা যায় বাড়ি আর বাগান করতে তার হাজার পঁচিশেক টাকা খরচ হয়েছিল। বাড়িটি যেই শেষ হ'ল অমনি কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হ'তে হ'ল তাকে। প্রতিদ্বন্দ্বী না ব'লে প্রতিদ্বন্দ্বিনী বলাই উচিত। স্বয়ং মা গঙ্গা এসে হাজির হলেন তার বাড়ির সামনে এবং দিন সাতেকের মধ্যে বাড়ি-বাগান সব গ্রাস করলেন।

মহাপ্রভু সিংয়ের টাকা ছিল, সুতরাং রোখ চ'ড়ে গেল। আর একটা বাড়ি করালো, সেটাও কেটে গেল। উপর্যুপরি পাঁচটি বাড়ি কেটে গেছে তার। শেষ বাড়িটি করিয়েছিল গঙ্গার ধার থেকে তিন মাইল দূরে। কিন্তু মা গঙ্গা তাকে রেহাই দেন নি, সেখানেও গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। আমিনকে ঘুষ দিয়ে যে সব জমি সে দখল করেছিল, সব গঙ্গাগর্ভে গেছে। মহাপ্রভু সিং এখন একটা খোড়ো ভাড়াটে ঘরে বাস করে। পাঁচ ছেলে ছিল, সব মারা গেছে একে একে। চোখে দেখতে পায় না। একটা পুরোনো চাকর তাকে হাত ধ'রে ধ'রে নিয়ে বেড়ায়। কাল আমার কাছে এসেছিল চিকিৎসা করাবার জন্যে। তার সর্বাঙ্গে কি যেন বেরিয়েছে। দেখলাম কুষ্ঠ হয়েছে। কথাটা শুনে থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল। তারপর অজ্ঞান হ'য়ে গেল। নরক কি এর চেয়েও বেশী ভয়ংকর ?

আমার এখানে প্র্যাকটিস বেড়েছে বলে' অনেকের রাত্রে ঘুম নেই, অনেকের টনক নড়েছে, অনেকের চোখ টাটিয়েছে। শুনছি আমার

বিরুদ্ধে একটা দরখাস্ত গেছে উপরওলার কাছে। আমি নাকি হাসপাতালের কাজ ফাঁকি দিয়ে কেবল প্র্যাকটিস করে' বেড়াই। আমি নাকি নিজে বাড়িতে ওষুধ রেখে তা বিক্রি করি।

যে সব ওষুধ হাসপাতালে নেই বা বাজারে সহজে পাওয়া যায় না কিংবা যে সব ওষুধ ইমার্জেন্সীর জন্য হঠাৎ দরকার হয় তা নিজের কাছে রাখবার অনুমতি আমি অনেক আগেই নিয়ে রেখেছি কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে। আমি হাসপাতালের কাজ ফাঁকি দিয়ে প্র্যাক্‌টিস করছি এ অপবাদও টিকবে না, কারণ আমি এখানে এসে যতগুলো অপারেশন করেছি এবং রোজ করি তত আমার আগে আর কেউ করেন নি। সুতরাং ওই দরখাস্ত আমার কেশস্পর্শ করতে পারবে না। হৃদয় স্পর্শ করেছে কিন্তু। দরখাস্তকারীদের নাম জানতে পেরে প্রাণে বড় ব্যথা পেয়েছি। সবই প্রায় বাঙালী এবং অনেকেই আমার কাছে উপকৃত।

ব্যাঙ্কের খাতাটা হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাই আজ আলমারির ড্রয়ারগুলো খুঁজছিলাম।

অনেক চিঠি আর পুরোনো কাগজপত্রের ভিড়ে যেন দিশাহারা হ'য়ে পড়লাম। অতীতের পুরোনো বন্ধুরা যেন ঘিরে দাঁড়াল আমাকে একসঙ্গে। যারা একদিন কত আত্মীয় ছিল আজ তারা কে কোথায় আছে জানি না। কয়েকজনের মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছি। অন্যদের কোন খবরই জানি না। যখন ভাগলপুরে ছিলাম তখন আমার ধোপার নাম ছিল কারু। ছোট একখানা খাতার উপর মনুর হাতে লেখা আছে দেখছি—কারুর হিসাবের খাতা।

মনুর একটা চিঠিও পেলাম। মনু লিখেছে "তোমার জন্যে আমার বড় ভাবনা হয়। তুমি শরীরের যত্ন কোরো। আজবলালকে

বোলো যেন তোমার মোটরের টিফিন কেরিয়ারে রোজ লুচি, তরকারি আর ডিমের ওমলেট করে' দেয়। থারমসে ঠাণ্ডা জলও ভরিয়ে নিও। ঠাকুরপো চিঠি লিখেছে তুমি নাকি সকালে খালি পেটে চা খেয়ে বেরিয়ে যাও, আর ফেরো বেলা দেড়টা দুটোর সময়। অতক্ষণ খালি পেটে থাকলে পিত্তি পড়বে না? আজবলালকে দিয়ে খাবার করিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেও। বাবা আমাকে যেতে দিচ্ছেন না এখন, তাই আটকে পড়েছি। কিন্তু তুমি যদি শরীরের উপর অত অত্যাচার কর তাহলে আমাকে বাধ্য হয়ে চলে' যেতে হবে। আমার জন্যে ভেবো না। আমার শরীর বেশ ভালো আছে। আমি মরব না। এদেশে মেয়েরা অমর। আমার আশেপাশে রোজ যতগুলি মেয়ে দেখি তাদের অধিকাংশই বিধবা। আমার কিছু হবে না, তুমি ভেবো না। নিজের শরীরের যত্ন কোরো তুমি। আমি বোধহয় দিন পনরো পরে যাব। এই সপ্তাহেই যেতাম, কিন্তু বাবা ছাড়ছেন না··· ।"

মানুষ যখন ভবিষ্যদ্বাণী করে তখন তার আত্মপ্রত্যয়ের সীমা থাকে না। কিন্তু মহাকালের বিচারে সব ভবিষ্যদ্বাণী বুদ্বুদের মতো ফেটে যায়। মনু আজ কোথায়? শুধু সে যে সশরীরে বেঁচে নেই তা নয়, আমার মনের ভিতরও নেই। তার স্মৃতি ক্রমশঃ ঝাপসা হ'য়ে আসছে। আজকাল ক্বচিৎ তাকে মনে পড়ে।

রেভারেণ্ড টমসনের সঙ্গে আজ দেখা হ'ল। দেখা হ'য়ে কৃতার্থ হ'য়ে গেলাম। অত বড় বিদ্বান্, অমন শান্ত অমন নিরহংকার পরোপকারী লোক আমি আর দেখি নি। এক অখ্যাত পল্লীর এক-প্রান্তে বাস করেন তিনি একটা মাটির খোড়ো ঘরে। সামনে সামান্য একটু জমি আছে। তারই একাংশ কঞ্চি দিয়ে ঘিরে সামান্য একটু

শাকসব্‌জির বাগান তাঁর। নিজেই তার দেখা-শোনা করেন। স্বপাক খান। অতি সাধারণ খাওয়া। ওই শাকসব্‌জি, ভাত আর একটু দুধ। একটু কথা কয়ে' বুঝলুম জ্ঞানের সমুদ্র। ডাক্তারি শাস্ত্রেও আমার চেয়ে বেশী পণ্ডিত বলে' মনে হ'ল। ক্যানসার সম্বন্ধে ফরাসী-ভাষায়-লেখা একটা বই দেখালেন আমাকে।

আমি তাঁকে বললুম—ফরাসী ভাষা আমি জানি না।

তখন তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করে' করে' কিছু পড়ে' শোনালেন। অত বড় পণ্ডিত লোক, কিন্তু কথার ব্যবহারে বিনয় যেন বিকীর্ণ হচ্ছে আলোর মতো। আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা কইলেন যেন আমি তাঁর গুরু। তাঁর শোবার ঘরে দেখলাম একটি বড় ক্রশ রয়েছে। তার সামনে বসেই তিনি সকাল-বিকেল প্রার্থনা করেন। কাউকে কখনও ক্রিশ্চান হ'তে বলেন না, বলেন ভাল হও। তাঁর কাজ হচ্ছে সেবা। অনেকগুলি ছোট ছেলেকে বিনাপয়সায় পড়ান রোজ। কারো অসুখ হ'লে শুশ্রূষা করেন। সাধারণ ওষুধ বিতরণ করেন বিনামূল্যে। কাছে একটা জঙ্গল আছে সেখানে রোজ যান সকালে। নিজের রান্নার জন্যে সংগ্রহ ক'রে আনেন শুকনো ডালপালা আর সংগ্রহ করেন বট্যানিক্যাল্ গবেষণার জন্য নানারকম নমুনা। একটি ছোটখাটো ল্যাবরেটরি আর মাইক্রস্‌কোপও আছে তাঁর। আর আছে অসংখ্য ভক্ত যারা তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে ব্যগ্র, কিন্তু তাদের সাহায্য তিনি কদাচিৎ নেন। তাঁর প্যাণ্টে আর জুতোয় দেখলাম নানারঙের তালি। আসবাবের মধ্যে দুটি কেরোসিন কাঠের টেবিল, গুটি চারেক মোড়া, একটি তক্তাপোশ।

এই সামান্য উপকরণেই তাঁর জীবন সমৃদ্ধ, পরম আনন্দে বাস করছেন মহর্ষির মতো। শুনেছি কোনো এক বিলিতী মিশনারি ফাণ্ড থেকে তিনি মাসিক পঞ্চাশ টাকা পান। তা দিয়ে প্রতিমাসে ওষুধ

কেনেন প্রায় কুড়ি টাকার। কুইনিন, অ্যাস্‌পিরিন, সাল্‌ফা ড্রাগস্‌, আইওডিন, স্পিরিট আর ওই জাতীয় সস্তা সাধারণ ওষুধ।

আমাকে ডেকেছিলেন নিজের দাঁত তোলাবার জন্য। আমি ফী নিতে চাইলাম না। তখন তিনি বললেন—তাহলে আপনার নামে ৫৲ টাকা আমি ডোনেশনস্বরূপ নিচ্ছি। ডোনেশনের রসিদ একটা দিলেন আমাকে। একাধারে এত গুণের শোভন সমন্বয় আমি আর দেখি নি।

প্রত্যেক লোকই একটা-না-একটা কিছু অবলম্বন করে' টিকে থাকেন। বাইরের অবলম্বন নয়, মনের অবলম্বন। এই অবলম্বন না থাকলে মানুষ নোঙ্গরহীন নৌকার মতো সংসার-সাগরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হন। এই অবলম্বনই তাঁর শক্তির উৎস, ব্যক্তিত্বের কেন্দ্র। এই অবলম্বনেরই বোধ হয় অপর নাম অহংবোধ বা অহংকার। কারও জ্ঞানের অহংকার, কারও ধর্মের অহংকার, কারও যশের অহংকার, কারও বা টাকার অহংকার। এই সব নোঙ্গরের সহায়তায় আমরা নিজেদের জীবনকে স্থির রাখবার চেষ্টা করি। যিনি ধার্মিক তিনি ধর্মকে আঁকড়ে থাকেন, যিনি জ্ঞানী তিনি জ্ঞানকে। যিনি ধনী তিনি মনে করেন টাকার জোরেই তিনি টিঁকে থাকবেন। আজ কিন্তু নেকিচাঁদকে দেখে মনে হ'ল ধনের নোঙ্গরটাই বোধ হয় সব চেয়ে বেশী অপলকা। একটা বড় ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে, নেকিরাম ভিখারীর মতো হাহাকার করে' বেড়াচ্ছে। টাকাই তার সর্বস্ব ছিল, এখন সে নিঃস্ব।

আর মাস দুই পরেই আমাকে রিটায়ার করতে হবে। রিটায়ার

ক'রে কোথায় যাব ? কি করব ? আমাদের সমসাময়িক অনেকেই রিটায়ার করে' প্র্যাকটিস করতে বসেছেন। এঁদের অনেকের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ হয়েছিল। আলাপ ক'রে হতাশ হয়েছি। প্রত্যেকেই দেখলাম আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ, অনেকে আবার বিষকুম্ভ পয়োমুখ। কেউ সুখী নয়। অনেকের ধারণা শহরের লোকেরা তাঁকে যথোচিত মর্যাদা দেয় নি, অনেকের বিশ্বাস তিনি জ্ঞানে বুদ্ধিতে এত অধিক উচ্চস্তরের যে সাধারণ লোক তাঁদের নাগাল পায় না। সুতরাং যতটা প্র্যাকটিস হবে তাঁরা আশা করেছিলেন ততটা হয় নি এবং সেজন্য তাঁরা মনে মনে ক্ষুব্ধ, যদিও বাইরে একটা 'ডোণ্ট কেয়ার' ভাব ফুটিয়ে রেখেছেন। শহরের অন্য ডাক্তারদের প্রতি অসীম অবজ্ঞা তাঁদের।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এরকম একটা ভণ্ডামির মুখোশ পরবার ইচ্ছে নেই। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টাকার জন্যে হায় হায় করবারও প্রবৃত্তি নেই আমার। দরকারও নেই। যা রোজগার করেছি তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু করব কি ? চুপ করে' তো বসে' থাকা যাবে না। কিছু একটা করতেই হবে। অনেকের বুড়ো বয়সে ধর্মে মতি হয়। আমার কিন্তু সে মতি এখনও হয় নি। জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি। ডাক্তারি ছাড়া আর কিছুতে প্রবৃত্তি নেই। আর কিছু জানিও না। কিন্তু কোথায় ডাক্তারি করব ! যারা মিথ্যে সার্টিফিকেট লিখে, অ্যাবর্শন করিয়ে, দালালকে কমিশন দিয়ে প্র্যাকটিস জমায় তাদের ভিড়ে গিয়ে গুঁতোগুঁতি করতে হবে শেষে ? ওদের চেয়েও respectable তথাকথিত অনেস্ট ডাক্তারও যে নেই তা নয়, কিন্তু তাদের সবজান্তা ভাব, তাদের আত্মম্ভরিতা, তাদের আন্তরিকতার অভাব, তাদের মেকি হাসি এবং লেফাপাদুরস্ত ভদ্রতা আরও অসহ্য মনে হয় আমার কাছে।

মনে আর একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। জীবনের শেষে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে গিয়ে বাস করব, তাদের নিয়েই থাকব। কিন্তু এখন অনুভব করছি আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কেউ আমার আত্মীয় নয়। অধিকাংশই শত্রু। হয় প্রকাশ্যে বিরোধিতা করে, না হয় মনে মনে বিরুদ্ধভাব পোষণ করে। কাউকে আমি আপন করতে পারিনি। হয়তো এটা আমার নিজেরই দোষ, কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে বুঝেছি যে ওদের সঙ্গে বাস করা যাবে না। কি করব তাহলে? কোন তীর্থে গিয়ে থাকব? দু'একটা তীর্থস্থানে ইতিপূর্বে বেড়াতে গেছি। ভালো লাগে নি। সমস্যায় পড়েছি কি করব।

এইখানেই একটা বাড়ি কিনে ফেললাম। বাড়িটার অসুবিধা অনেক। শহর থেকে দূরে। পাড়াটাও ভালো নয়। কিন্তু প্রকাণ্ড হাতা আছে বাড়িটার চারধারে। হাত পা ছড়িয়ে থাকতে পারব। শহরের মাঝখানে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে থাকতে পারি না আমি। ক'লকাতায় ওই জন্যেই গেলাম না। সেখানে গিয়ে কিই বা করতুম? তাস খেলা, আড্ডা দেওয়া বা পার্কে চক্কোর দিয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি করার বাতিক আমার নেই। ক'লকাতা একটা সমুদ্র বিশেষ। তার মধ্যে সাপ হাঙরও আছে, আবার মণি-মাণিক্যও আছে।

অনেকদিন ক'লকাতায় বাস করলে মনের মতো সঙ্গী হয়তো পেতে পারতুম। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ গিয়ে তা পাব না। কিছুদিন আগে ক'লকাতায় গিয়েছিলাম। দেখলাম সব অচেনা। চেনা লোকেরাও অচেনা হ'য়ে গেছে। সবাই নিজের নিজের ঘানিতে বাঁধা, অপরের দিকে তাকাবার কারও অবসর নেই। দেখা হলেই মুচকি হাসিটা আর নমস্কারটাও যেন বাঁধা ফরমূলার মতো

যন্ত্রচালিতবৎ। প্রাণ নেই, আন্তরিকতার অভাব। এরকম মরুভূমিতে টেকা যাবে না। তাই এখানে থাকাই স্থির করলাম। এখানে অনেককেই চিনি, অনেকে আমাকেও চেনে। এদের মধ্যে থেকেই বাকি জীবনটা কাটাব। পুরাতন উপকরণ দিয়েই নূতন জীবনের রাস্তা একটা তৈরি করতে হবে ভেবে-চিন্তে। দেখা যাক কি করতে পারি।

এখানকার স্বরূপ পাণ্ডের ছেলে পাগল হ'য়ে গিয়েছিল। তাকে কাঁকে নিয়ে যেতে বলেছিলুম, কিন্তু নিয়ে যায় নি। নিয়ে গিয়েছিল এক দেহাতী কবিরাজ বজ্‌রংগী মিশিরের কাছে। বজ্‌রংগী মিশির বেশ কৃতবিদ্য কবিরাজ। কাশীতে অনেকদিন পড়াশোনা করেছেন। কিন্তু তিনি কবিরাজী প্র্যাক্‌টিস করেন না, করেন চাষবাস। স্বরূপ পাণ্ডের সঙ্গে তাঁর নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা হয়েছিল। স্বরূপ পাণ্ডেকে দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন—"কে আপনি, কি চান?"

"আমার ছেলে পাগল হ'য়ে গেছে"

"তা আমি কি করব—"

"আপনার কাছে চিকিৎসার জন্যে এনেছি—"

"আমি চিকিৎসা করি না। তাছাড়া এখন আমার ফুরসত নেই, আমার গম দৌনি হচ্ছে—"

"যদি দয়া করে' একবার দেখেন ওকে—"

"আমি দয়া করলে কিচ্ছু হবে না। মহাপাপ না করলে লোকে পাগল হয় না। ভগবান দয়া করলে কিছু হ'তে পারে। আমি দয়া করলে কিছু হবে না"

"না, তবু কিছু ওযুধ বলে' দিন—"

"পাপের ওষুধ প্রায়শ্চিত্ত। তাই কর গিয়ে—"

স্বরূপ পাণ্ডে বিব্রত হ'য়ে পড়লেন।

তারপর বললেন, "আপনার উপর আমাদের অগাধ বিশ্বাস। আপনার নাম শুনে এসেছি। এমন করে' তাড়িয়ে দেবেন না"

"ও আমার উপর বিশ্বাস আছে না কি? আচ্ছা, তাহলে এক কাজ কর। ওই যে কুয়োটা দেখছ ওর জল তুলে ওকে খাওয়াও আর ওই জলে ওকে চান করাও—"

"আর কোন ওষুধ দেবেন না?"

"ওই ওষুধ"

এই বলে' মিশিরজী তাঁর ছাতা আর লাঠি নিয়ে মাঠের দিকে চলে' গেলেন। মিশিরজীর বাড়ির চাকর দীনু বললে—"উনি যা বললেন তাই এখন করুন কয়েকদিন। যদি ওই করে' কয়েকদিন টিকে থাকতে পারেন তাহলে উনি ভাল করে' দেখে ওষুধ দেবেন"

সাত দিন পরে মিশিরজী বললেন—"আচ্ছা এবার ওকে আন দেখি।"

প্রায় আধঘণ্টা নাড়ী ধরে' বসে' রইলেন। তারপর ওষুধ দিলেন। স্বরূপ পাণ্ডের ছেলে ভালো হ'য়ে ফিরে এসেছে।

আমার প্ল্যান ঠিক করে' ফেলেছি। খুব বড় একটা 'স্টেশন ওয়াগন্' কিনলাম। তাতে শোবার জায়গা, রাঁধবার জায়গা, এমন কি ছোটখাটো একটা ড্রইংরুমের মতোও আছে। শতকরা আশীটা অসুখ যে সব সাধারণ ওষুধ দিয়ে সারে সেগুলোও অনায়াসে রাখা যাবে ওতে। প্রচুর জায়গা আছে গাড়িটাতে। ভ্রাম্যমাণ ডাক্তার

হব ঠিক করেছি। গ্রামে গ্রামে হাটে বাজারে ঘুরব। চিকিৎসা করব সাধারণ লোকেদের। চিকিৎসা করব পয়সা রোজগার করবার জন্য নয়, নিজের তাগিদে। কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা না করলে হতাশার কবলে পড়তে হবে না।

চার

মৎস্যব্যবসায়ী আবহুলের বাড়ি শহর থেকে প্রায় মাইল চারেক দূরে। সেখানে একটা খোলার ঘরে সে সপরিবারে বাস করে। ডাক্তার সদাশিবের মোটর তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল। আর মোটরটা ঘিরে দাঁড়িয়েছিল একপাল উলঙ্গ ছেলে-মেয়ে।

সদাশিব রমজুকে একটা ইন্‌জেকশন দিয়ে বেরিয়ে এলেন খোলার ঘর থেকে। আর তাঁর পিছু পিছু বেরিয়ে এল এক পলিত-কেশা বৃদ্ধা। আবহুলের নানী, অর্থাৎ ঠাকুমা। অনেক শোক পেয়েছে সে। স্বামী পুত্র নাতি নাতনী সবই প্রায় মারা গেছে। বেঁচে আছে কেবল আবহুল আর তার ছেলে রমজু। বুড়ীর পরনের কাপড় ছেঁড়া ময়লা। মুখের ভাবে কোন স্নিগ্ধতা নেই। আছে একটা 'মরিয়া' ভাব। সদাশিব মোটরের ভিতর থেকে কয়েকটি গুলি বার করে' তার হাতে দিয়ে বললেন—"চার ঘণ্টা অন্তর খাওয়াবে। দেখি তোমার চোখের খবর কি—"

চোখের পাতা তুলে দেখলেন।

"পাকতে দেরি আছে এখনও। আগামী শীতে কেটে দেব তোর ছানি।"

বুড়ী ঝাঁঝিয়ে উত্তর দিলে—"দরকার নেই আমার চোখ কাটিয়ে।

পারো তো আমার কান দুটোও কালা করে' দাও। আমি কিছু দেখতেও চাই না, শুনতেও চাই না—"

ডাক্তার সদাশিব বুড়ীর থুতনিটি নেড়ে হেসে বললেন—"এত রাগ কেন নানী? ভগবানকে ভুলে গেছিস্?"

এই কথায় ঝরঝর করে' কেঁদে ফেললে নানী। ময়লা কাপড় দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বললে-"আমি ভগবানকে ভুলি নি ডাক্তারবাবু, ভগবানই আমাকে ভুলেছেন।"

সদাশিব করুণ দৃশ্য এড়িয়ে চলতে চান।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে উঠে বললেন—"আলী, হাজিপুর হাটে চল।"

"বহুত খু"—

পাঁচ

হাজিপুরের হাট প্রকাণ্ড হাট। রাস্তার পাশেই প্রকাণ্ড একটা গাছ আছে। প্রচুর ছায়া। সেই ছায়াতে টেবিল আর চেয়ার পেতে রোগী দেখছিলেন সদাশিব। একটি ফোল্‌ডিং টেবিল আর ফোল্‌ডিং চেয়ারও থাকে তাঁর মোটরে। রোগী অনেক। অধিকাংশই সাধারণ রোগ। ম্যালেরিয়া, আমাশয়, চোখ-ওঠা, খোস, দাদ। যক্ষ্মাও আছে দু'একটা।

একটা খাতায় নাম, অসুখের লক্ষণ এবং ওষুধের ব্যবস্থা লিখে নিজে হাতেই ওষুধ দেন সদাশিব। ওষুধের প্রকাণ্ড বাক্স একটা পাশেই থাকে। তাতে খোপ খোপ করা। কুড়িটা শিশি আঁটে। সব ওষুধই ট্যাবলেট-করা। পুরিয়া-করাও আছে কিছু কিছু। আর আছে ইন্‌জেকশন। সেগুলো আর প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রপাতি

আলাদা একটা বড় ব্যাগে থাকে। স্টেথোস্কোপ, ব্লাড-প্রেসার মাপদার যন্ত্র, থার্মোমিটার, ছোট একটা মাইক্রস্‌কোপ, স্লাইড, স্টেন এই সব। দরকার বুঝলে ওই গাছতলায় বসেই রক্ত, প্রস্রাব, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা ক'রে নেন সদাশিব। আর একটা তালাবন্ধ বাক্সও থাকে তাঁর পিছন দিকে। সেটার ডালার উপরে লম্বাটে গোছের ছিদ্র আছে একটা। তাতে ওষুধের দাম বাবদ যে যা খুশী দিতে পারে। কারো কাছে তিনি দাবি করেন না কিছু, যার যা খুশী দেয়। কেউ যদি না-ও দেয় আপত্তি করেন না সদাশিব।

তিনি এই বাক্সের ব্যবস্থা করেছেন কারণ অনেক লোক বিনা পয়সায় চিকিৎসা করাতে চায় না। আত্মসম্মানে বাধে। তাদের সম্মান বাঁচাবার জন্যেই এই বাক্সটি। বাক্সে যে পয়সা রোজ পড়ে তাতে ওষুধের দাম তো উঠে যায়ই, পেট্রোলের দামও উঠে যায়।

সদাশিব রোগী-দেখা শেষ ক'রে উঠতে যাচ্ছিলেন এমন সময় একটি রোগা আধ-ঘোমটা দেওয়া মেয়ে এগিয়ে এসে হঠাৎ তাঁর পায়ের কাছে উপুড় হ'য়ে পড়ল।

"এ কে—"

পাশেই একটি ট্যারা লোক দাঁড়িয়ে ছিল, সে অকারণে একটু হেসে বললে—"ও কেব্‌লি।"

"কি চায়—"

"ওর 'আদমি'কে থানায় ধ'রে নিয়ে গেছে। দারোগাবাবু আপনাকে খাতির করেন, আপনি যদি ব'লে দেন একটু ছাড়া পেয়ে যাবে।"

"হঠাৎ থানায় ধ'রে নিয়ে গেল কেন?"

"ছবিলাল মোড়লের বাড়ি চুরি হয়েছে। তিনি ওর নাম ব'লে দিয়েছেন দারোগাবাবুকে—"

"ওর নামই বা বলতে গেলেন কেন শুধু শুধু।"

"কি জানি। কেব্‌লি বলতে পারবে—"

কেব্‌লি থেমে থেমে বললে—"ছবিলালবাবু আমার 'আদমি'কে তাঁর খাপরার ঘর ছেয়ে দিতে বলেছিলেন। গতবার মজুরি দেন নি ব'লে এবার ও যায় নি। তাই উনি আমার এই সর্বনাশ করেছেন।"

কেব্‌লি কাঁদতে লাগল।

সদাশিবকে বলতে হ'ল—"আচ্ছা, আমি চেষ্টা ক'রে দেখব।"

সদাশিব তারপর হাটের ভিতর ঢুকলেন। কিছু কিনতে হবে। প্রতি হাটেই কিছু-না-কিছু কেনেন তিনি। তাঁর সংসারে খাবার লোক কেউ নেই, তবু কেনেন। এর জন্যে মালতীর কাছে বকুনি খেতে হয়। মালতী বলে—"এত সব খাবে কে। ঘরে প'ড়ে শুকোবে না হয় পচবে!' সদাশিব হেসে উত্তর দেন, "খাবার লোকের কি অভাব আছে। দাই, চাকর, তাদের ছেলেমেয়েরা, ভিকিরি—সবাইকে খাওয়া না"। "অত ঝক্কি আমি পোয়াতে পারব না"—মালতী বলে বটে, কিন্তু পোয়াতে হয়। রোজই বাড়িতে আট দশটা পাতা পড়ে। আজবলাল এতে মনে মনে খুব খুশী হয়, কিন্তু মুখে গজগজ করে। বলে—"একি বাজে খরচা!"

হাটে ঢুকেই সদাশিবের দেখা হল বিলাতী সাহের সঙ্গে। চালের বড় ব্যবসাদার। চকচকে টাক, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। ফতুয়া একটা পরেছে বটে, কিন্তু ভুঁড়ি ঢাকে নি। ভুঁড়ো নাক, নাকের নীচে কটা রঙের সামান্য গোঁফ। বেশ ভারী মুখ। হাসলে এবড়োখেবড়ো হলদে দাঁত বেরিয়ে পড়ে। সদাশিবকে দেখে ভক্তিভরে প্রণাম করলে বিলাতী সাহ।

"কেমন আছ বিলাতী?"

"হুজুরকা কির্‌পা। চলে যাচ্ছে।"

"আমার জন্যে চাল রেখেছ ?"

"ভাল চাল এলে নিজেই পাঠিয়ে দেব।"

"আচ্ছা।"

এগিয়ে গেলেন সদাশিব তরকারির বাজারের দিকে।

কয়েকটি বড় কুমড়ো তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কুমড়ো তিনি খান না। কিন্তু কুমড়োগুলোর নধর চেহারা দেখে কিনতে প্রবৃত্ত হলেন। যে বুড়ী কুমড়ো বিক্রি করছিল সে যেন কৃতার্থ হ'য়ে গেল। বেশ বড় দেখে ভালো একটা কুমড়ো বেছে দিয়ে বললে "এইঠো লে যা বেটা—"

"দাম কত ?—"

বুড়ী দেহাতী হিন্দী ভাষায় বললে—"তোর যা খুশী তাই দে—"

সদাশিব তাকে ছুটো টাকা দিলেন।

"ওত্‌না দাম নেই হোতে, আট আনা দে—"

সদাশিব হেসে বললেন তিনি কুমড়োর দাম দিচ্ছেন না, তিনি টাকাটা দিচ্ছেন তার মেয়ে রৌশনকে। বছরখানেক আগে বিধবা হয়েছিল সে।

সদাশিব জিগ্যেস করলেন, "রৌশনকে দেখছি না, সে কোথা ?"

তার আবার বিয়ে দিয়েছি ডাক্তারবাবু। জোয়ান মেয়েকে কতদিন আর ঘরে রাখব।"

"বেশ করেছিস।"

সদাশিবের সম্মতি পেয়ে নিশ্চিন্ত হল বুড়ী।

তারপর সদাশিব অগ্রসর হলেন মাছের বাজারের দিকে। ভাল মৌরলা মাছ ছিল। তাই কিনলেন কিছু। মাছের বাজারে দেখা হ'ল বাবুলাল মেথরের সঙ্গে।

"তোর এ বউ কেমন হ'ল ?"

একটু সলজ্জ হাসি হেসে বাবুলাল বলল—"ভালই তো মনে হচ্ছে—"

"রাধিয়ার সঙ্গে মারপিট করছে না তো।"

"না। দুজনে খুব ভাব।"

প্রথম বউ রাধিয়ার ছেলে হয়নি ব'লে বাবুলাল আর একটি বিয়ে করেছে। বাবুলালই মৌরলা মাছগুলি তার গামছায় বেঁধে নিয়ে মোটরে পৌঁছে দিয়ে এল।

একটা ফেরিওলা লাল-নীল কাগজের তৈরী পাখী বিক্রি করছিল। পাখীর পিঠে লম্বা রবারের সরু ফিতে আটকানো। সেইটে ধ'রে নাড়ালে পাখী নাচে। কয়েকটা কিনলেন সদাশিব। 'কেঁদ্' ব'লে একরকম ফল বিক্রি হয় এদেশে। কালচে-কমলা রং। খেতে মিষ্টি। একটি লোক এককোণে কয়েকটি 'কেঁদ্' নিয়ে বসেছিল। সদাশিব সেগুলিও কিনে নিলেন। কিছু তরি-তরকারিও কিনলেন। দোকানদাররাই সে সব পৌঁছে দিয়ে এল তাঁর গাড়িতে।

হাট থেকে বেরিয়ে তিনি গেলেন থানায় সিংহেশ্বর সিং দারোগার কাছে। নাম যদিও সিংহেশ্বর কিন্তু দেখতে জিরাফের মতো। ছিপছিপে, রোগা, ঘাড়টা খুব লম্বা। গালে মুখে চোখের কোলে ধবল হয়েছে। সদাশিবই চিকিৎসা করছেন তাঁর। কথা বলার ধরনটা একটু বেশী রকম উচ্ছ্বসিত।

"আইয়ে আইয়ে ডাকটার সাব। কেয়া সৌভাগ্য, কেয়া সৌভাগ্য—"

চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন এবং একটু ঝুঁকে সদাশিবের হাত দুটি ধ'রে বললেন—"আইয়ে, আইয়ে, আইয়ে—"

"কি খবর? ওষুধ খেয়ে কিছু উপকার হ'ল?"

"দো একঠো সাদা দাগকা বিচ্মে তো রং লগা হ্যায়।"

"তাহলে আস্তে আস্তে সারবে। সময় নেবে কিছু। আমি একটা অন্য দরকারে এসেছি। এখানকার নারান ব'লে একটা লোককে কি আপনি ধ'রে এনেছেন—"

"হাঁ।"

তারপর তিনি যা বললেন কেব্‌লি তা আগেই তাঁকে বলেছিল। ছবিলাল মোড়লের নির্দেশ অনুসারেই নারানকে ধরতে হয়েছে।

"নারানের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আছে ?"

"না। এন্‌কোয়্যারি চল রহা হা—"

"ওকে ছেড়ে দিন। ও নির্দোষ।"

গম্ভীর হ'য়ে গেলেন সিংহেশ্বর। সরু গোঁফের উপর আঙুল বুলোতে লাগলেন। হাঁটু নাচালেন বারকয়েক। তারপর বললেন—"আপ যব কহ্‌তে হেঁ তব জরুর দেঙ্গে—"

তারপর তাঁর লম্বা গলাটা বেঁকিয়ে সদাশিবের কানে কানে বললেন ছবিলালবাবুকেও যদি সদাশিব অনুরোধ করতেন তাহলে তাঁর পক্ষে সুবিধা হ'ত। সদাশিব বললেন, "ছবিলাল লোকটা সুদখোর মহাজন। ওর সঙ্গে আমার তেমন আলাপও নেই।"

সিংহেশ্বর এর উত্তরে হিন্দীতে যা বললেন তার বাংলা মর্মার্থ—"আলাপ ক'রে রাখুন আখেরে কাজ দেবে। উনি কংগ্রেসীদের পাণ্ডা, তারপর হরিজন, ওঁর একটা বাজেমার্কা ছেলে কেবল শিডিউল্‌ড্‌ কাস্ট ব'লে ভাল চাকরি পেয়েছে। ওই চাকরি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের ভালো ভালো ছেলেরা পায় নি। ওদেরই এখন প্রতাপ খুব—আলাপ করুন ওর সঙ্গে।"

সদাশিব চুপ ক'রে রইলেন।

তারপর বললেন—"আপনি নারানের বিরুদ্ধে যদি প্রমাণ না পান, ছেড়ে দিন। দেবেন তো ?"

"আপনি যখন বলছেন তখন দেব। কিন্তু ছবিলালজী ওর উপর চটেছেন কিনা, তাই একটু 'খত্‌রা' আছে,—দেখি।"

তারপর সিংহেশ্বর তাঁর ছোট ছেলে 'মুন্না'কে এনে দেখালেন। সর্বাঙ্গে খোস হয়েছে। তাকে ওষুধ দিয়ে চ'লে গেলেন সদাশিব।

সেদিন সদাশিব তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন—

"ইংরেজদের হাত থেকে শাসনভার আজকাল যাঁদের হাতে গেছে তাঁরা শুধু যে অকর্মণ্য তাই নন, তাঁরা অসাধুও। এঁদের শাসনকালে দেশের সত্যিকার উন্নতি কিছু হয় নি। স্কুল কলেজে ছেলেদের শিক্ষা হয় না। তারা গুণ্ডা হচ্ছে। শিক্ষকদের মারে, ভদ্রলোকদের হুমকি দেয়, মেয়েদের প্রকাশ্যে রাস্তায় অপমান করে, বিনা টিকিটে ট্রেনে বাসে চড়ে। পুলিস এদের কিছু বলে না। যদি কোন পুলিস বলে তাহলে তারই সাজা হয়, এদের হয় না। কর্তৃপক্ষ এদের তোয়াজ করেন, কারণ ইলেক্‌শনের সময় এদের উপরই ভরসা তাঁদের। বাজারে খাদ্যদ্রব্য এত দুর্মূল্য যে সাধারণ লোক তা কিনতে পারে না। দুধ মাছ মাংস ডিম খুব কম লোক খায়। চাল ডাল তরি-তরকারিও এত দুর্মূল্য যে তাও পেট ভ'রে খেতে পায় না। অথচ শোনা যায় নাকি সদাশয় গভর্নমেণ্ট চাষের উন্নতির জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন। টাকা খরচ হচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে টাকা ঢুকছে তাঁদের পেটোয়া লোকেদের পেটে।

"এখানে একটা পোল্‌ট্রি ফার্ম আছে। সেখান থেকে সাধারণ লোকে মুরগি বা ডিম পায় না। সেখানকার একজন কর্মচারী বলেছিলেন—'অফিসার আর মিনিস্টাররা সব মুরগি আর ডিম নিজেরা খেয়ে ফেলেন। পাব্‌লিককে দেবার মতো কিছু অবশিষ্ট থাকলে

তো দেবে!' বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা ধার ক'রে এনে যেসব বড় বড় কাণ্ড-কারখানা হচ্ছে এদেশে সে সবের মধ্যেও চুরি-জোচ্চুরি এবং পেটোয়া-পোষণের ধুম প'ড়ে গেছে নাকি। আসল কাজ যতটা হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি।

"সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে হরিজন আর শিডিউল্ড্ কাস্টের লোকেদের পোয়া বারো হয়েছে, অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রা নিষ্পিষ্ট হ'য়ে মারা যাচ্ছে। তাদের মুখের ভাষা পর্যন্ত কেড়ে নেবার চেষ্টা করছেন ওঁরা। মুসলমান আমলে ফারসী আদালতের ভাষা ছিল, ইংরেজদের আমলে ছিল ইংরেজী—এঁদের আমলে এঁরা করছেন হিন্দী। অন্যান্য ভাষাকে পিষে হিন্দীর জগদ্দল রোলার চালিয়েছেন এঁরা। সাধারণ স্কুলে ইংরেজী অবহেলিত হচ্ছে। কিন্তু মিনিস্টারদের ছেলেরা বিলিতী স্কুলে, কনভেণ্টে, কিণ্ডারগার্টেনে ইংরেজী ঠিক শিখছে। কারণ তারা জানে যে ইংরেজী না জানলে আধুনিক জগতে এক পা-ও চলা যাবে না। তারা চলবে, কিন্তু পিছনে প'ড়ে থাকবে হতভাগ্য তারা যারা হিন্দী ছাড়া আর কিছু শেখে নি।

"আমাদের স্বাধীন ভারতে আর একটা ব্যাপারও হচ্ছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে লোপ ক'রে দেবার চেষ্টা করছেন কর্তৃপক্ষরা। তারা শিক্ষা পাচ্ছে না, চাকরি পাচ্ছে না। নানা অজুহাতে—কখনও জমিদারিপ্রথা লোপ ক'রে, কখনও বা জমির সিলিং ক'রে—তাদের বিষয়-সম্পত্তিও সরকার বাজেয়াপ্ত করছেন। মজুরদের মাইনে বা মজুরি সাতগুণ আটগুণ বেড়েছে—কিন্তু শিক্ষকের, ডাক্তারের, কেরানীর এমন কি গভর্নমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতনও সে অনুপাতে বাড়ে নি। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলেরাই এই সব কর্মে নিযুক্ত। এদের কারও চিত্তে সুখ নেই। সবাই মনে মনে গোমরাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ ভুলে গেছেন যে স্বাধীনতা-সুখ আজ তাঁরা রাজার মতন ভোগ

করছেন সে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরই ছেলেরা। তাদের ত্যাগ, তাদের আত্মবলিদান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, কিন্তু দেশের কর্তৃপক্ষেরা সে ঋণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

"প্রাদেশিকতা উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে প্রতি প্রদেশে। প্রতিটি প্রদেশই ছোট ছোট পাকিস্তানে পরিণত হয়েছে। সবাই সবাইকে হিংসা ও ঘৃণা করে।

"আমাদের কর্তৃপক্ষদের আজকাল প্রধান কাজ হচ্ছে বিদেশী তোষণ। রাশিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড, ইজিপ্ট, চীন প্রভৃতি দেশের নেতারা প্রায়ই এদেশে আসছেন, মালা প'রে খানা খেয়ে রাস্তার দু'পাশে হুজুকে বেকার লোকেদের ভিড় দেখে চ'লে যাচ্ছেন এবং এই মহৎ কর্মের জন্য আমাদের কোটি কোটি টাকা খরচ হ'য়ে যাচ্ছে। আমাদের স্বাধীনতাকে নিরাপদ করবার জন্যে শক্তিশালী বিদেশী রাজ্যের সঙ্গে দহরম-মহরম রাখা হয়তো প্রয়োজন, কিন্তু দেশের স্বাধীনতা মূলতঃ নির্ভর করে দেশের লোকের সদিচ্ছা এবং চরিত্রবলের উপর। এই কথাটা কর্তৃপক্ষেরা ভুলে গেছেন।

"আমি নানাস্থানে ঘুরি, নানা স্তরের লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়, বর্তমান গভর্নমেণ্টের উপর কাউকে সন্তুষ্ট দেখি না। ধনী দরিদ্র সবাই এই শাসনব্যবস্থার উপর চটা। সকলের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে—এবং অনেক স্থলেই তা অমূলক নয়—যে আমাদের শাসনব্যবস্থার শীর্ষে যাঁরা অবস্থান করছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই অপদার্থ, স্বার্থপর এবং অসাধু। তাঁরা অসাধু বলেই তাঁরা দেশের অসাধুতা নিবারণ করতে পারছেন না, তাঁদের কথা মানছে না কেউ। সুতরাং চোর ডাকাত জুয়াচোর কালোবাজারীতে দেশ ভ'রে যাচ্ছে।

"ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতারও প্রধান কারণ তাদের সামনে নির্মল-আদর্শনিষ্ঠ কোন নেতা নেই। নেতারা তোতাপাখীর মতো যেসব বুলি আওড়ান কার্যকালে ঠিক তার উলটো কাজটি করেন। সুতরাং তাঁদের কথায় আর কারও আস্থা নেই। আমার বিশ্বাস সামনে ভালো আদর্শ থাকলে এই ছেলেরাই অন্যরকম হ'ত।

"ইতিহাসের পাতা ওলটালে জানা যায় অসাধুতা-অপটুতা-আত্মম্ভরিতার রাজত্ব বেশীকাল টেকে না। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা ভাবলে ভয় হয়। দুঃখও হয়। কোন্ অতলস্পর্শী গহ্বরের দিকে এগুচ্ছি আমরা!"

ছয়

সকাল নটা নাগাদ সদাশিবের মোটর যথারীতি বাজারের সামনে দাঁড়াল। সারি সারি মুরগিওলারা বসেছিল তাদের ঝাঁকা নিয়ে। তারা সাধারণতঃ পথের ধারেই বসে। সদাশিবকে দেখে দু'একজন সেলাম ক'রে উঠে দাঁড়াল।

সদাশিব আলীকে বললেন, "আলী, কয়েকটা ভালো মুরগি বেছে নাও তো।"

"বহুত খু"—

সদাশিব বাজারের ভিতর ঢুকলেন।

আবদুলের মুখ উদ্ভাসিত, তার ছেলের জ্বর ছেড়ে গেছে। সে বললে কিছু বড় বড় মাগুর মাছ সে তাঁর জন্যে কিনে রেখেছে। চারটে মাগুর মাছের ওজন হয়েছে সওয়া সের।

"কোথা আছে সেগুলো—"

"আলাদা হাঁড়িতে ক'রে গুদামে রেখে দিয়েছি—"

"আমার গাড়িতে দিয়ে আয়।"

ঘাড় ফিরিয়েই সদাশিবের দৃষ্টি পড়ল একটি নবাগত ভদ্রলোকের দিকে। অত্যন্ত মোটা। একটা হিপোপটেমাস যেন মনুষ্যমূর্তি ধারণ করেছে। তাঁর মাছ কেনবার ধরন দেখে বিস্মিত হলেন সদাশিব। এক মেছুনী কতকগুলো ছোট মাছ বিক্রি করছিল। তিনি মাছের স্তূপের ভিতর থেকে একটি ছোট মাছ লেজ ধ'রে তুললেন।

"এটার কত দাম নিবি? এক পয়সা?"

"ওই একটা মাছই নেবেন আপনি!"

মুচকি হেসে জিগ্যেস করলে মেছুনী। নাম ছিপলি। সদ্য যৌবনোদ্গম হয়েছে তার। কথায় কথায় হাসে।

হিপো বললেন—"হ্যাঁ। একটাই নেব—"

"নিয়ে যান। ওর আর দাম দিতে হবে না।"

অম্লানবদনে তিনি মাছটি মাছের থলিতে পুরে ফেললেন। হেসে লুটিয়ে পড়ল মেছুনীটা। হিপো আর একটা মেছুনীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সে-ও ছোট মাছ বেচছিল। সেখান থেকেও একটি ছোট্ট মাছ বেছে তুললেন তিনি।

"এটার কত দাম নিবি? এক পয়সা?"

এ মেছুনীটা বুড়ী। হিপোর কাণ্ড দেখে চ'টে গেল সে। বললে—"একটা মাছ আমি বেচব না। আধ পোয়া নিতে হবে অন্তত—"

"কিন্তু তোমার সব মাছ তো টাটকা নয়। বাসি মাছও মিশিয়ে দিয়েছ অনেক—"

বুড়ী চুপ ক'রে রইল, কোন জবাব দিলে না।

"আচ্ছা দু'পয়সা দিচ্ছি, দিয়ে দে মাছটা।"

বুড়ার চোখের দৃষ্টিতে যেন আগুন জ্ব'লে উঠল। মাছটা ছুঁড়ে দিলে হিপোর দিকে। হিপো ছুটো পয়সা দিয়ে গম্ভীরভাবে এগিয়ে গেলেন আর একটা মাছের দোকানে। এ দোকানদারও একটা মাছ বেচতে রাজী হ'ল না। ঝাঁকড়া-গোঁফ ভগলু মহলদার রসিক লোক। সে হাসিমুখে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত হিপোর দিকে, তারপর ছু'হাত তুলে নমস্কার করল।

"দিবি না মাছটা ?"

"একটা মাছ বিক্রি করি না। আপনার মতো লোককে ভিক্ষে দিতেও সাহস পাচ্ছি না। কি করব ভাবছি।"

সদাশিব এগিয়ে গিয়ে চোখের ইঙ্গিত করতেই ভগলু মাছটা দিয়ে দিলে হিপোকে। ডাক্তারবাবুকে অমান্য করবার সাহস হ'ল না তার। হিপো আর একটা দোকানে গিয়ে আর একটা ছোট মাছ চার পয়সা দিয়ে কিনলেন। এই মেছোটা মোচড় দিয়ে বেশী একটু দাম নিয়ে নিলে।

সদাশিব এগিয়ে গিয়ে আলাপ করলেন ভদ্রলোকের সঙ্গে।

"নমস্কার। আপনাকে তো এর আগে দেখেছি ব'লে মনে পড়ছে না—"

"নমস্কার। আমি এখানে থাকি না। চেঞ্জে এসেছি—"

"ও। কোথায় আছেন ?"

"ঘোষ-নিবাসে।"

"ও, তাহলে তো আমার বাড়ির কাছেই !"

"আপনার পরিচয়টা দিন—"

"আমি রিটায়ার্ড ডাক্তার একজন। এখানেই একটা বাড়ি কিনে বাস করছি—"

"ও, তাহলে আপনার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে তো সুবিধেই হ'ল।

আমি ডায়াবিটিস্ রুগী মশাই। তার উপর বাত। ডাক্তার বলেছে ছানা খেতে আর ছোট মাছ। ভাত রুটি বন্ধ—”

“কিন্তু আপনি তো মাত্র চারটি ছোট মাছ কিনলেন—”

“বেশী নিয়ে কি করব। নিজে হাতে কুটতে হবে, নিজে হাতে রাঁধতে হবে। তাছাড়া একটু পচা বা দো-রসা হ’লে আর খেতে পারি না। তাই খুব বেছে বেছে কিনতে হয়—”

“আপনি একাই এসেছেন ?”

“দোকা আর পাব কোথা! আমাকে ফেলে সবাই যমের বাড়ি চ’লে গেছে। বউ ছেলে মেয়ে সব—”

হিপোর চোখ দুটো বিস্ফারিত হ’য়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত তিনি নিষ্পলক হ’য়ে চেয়ে রইলেন সদাশিবের মুখের দিকে। অস্বস্তি ভোগ করতে লাগলেন তিনি। তারপর বললেন, “আচ্ছা, আমি আপনার টাটকা মাছের ব্যবস্থা ক’রে দিচ্ছি। এই ভগলু—”

ঝাঁকড়া-গোঁফ ভগলু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে—“জি হুজুর—”

“এই বাবুর জন্যে রোজ চার পাঁচটা টাটকা মাছ আলাদা ক’রে রেখে দিও।”

“চেষ্টা করব হুজুর। তবে আমি তো মাছ পাইকারদের কাছ থেকে কিনি, সব সময় টাটকা মাছ পাই না—”

সেই হাসিমুখী তরুণী মেছুনীটি এগিয়ে এল। বললে—“আমি গঙ্গার ঘাট থেকে মাছ আনি। আমি রেখে দেব রোজ—”

“অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। নমস্কার।”

কোনক্রমে দেহভার বহন ক’রে ভিড় ঠেলে ঠেলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

“এই যে ডাক্তারবাবু! গুড্ মর্নিং। বাজারের সব মাছ কিনে ফেললেন না কি! আমাদের জন্যে কিছু অবশিষ্ট আছে তো—”

পি. ডব্লিউ ডি. আফিসের কেরানী খগেন সরখেল। হিংসুকে লোক। সদাশিব যে রোজ এত মাছমাংস কেনেন এটা বরদাস্ত করতে পারেন না। দেখা হ'লে প্রায়ই যে সব মন্তব্য করেন তাতে একটু খোঁচা থাকে। সদাশিব গ্রাহ্য করেন না এসব। প্রায়ই মুচকি হেসে তাঁর কথার জবাব দেন।

"কি মাছ কিনলেন আজ ?"

"মাগুর।"

"মাগুর ? কই, মাগুর তো কোথাও দেখলাম না। পেলে নিতাম কিছু।"

"নিন না। আমি যেগুলো নিয়েছি সেগুলো আপনিই নিয়ে যান। আমি অন্য মাছ নিচ্ছি। আবদুল, বাবুকে মাগুর মাছগুলো দিয়ে দাও।"

আবদুল বললে—"আচ্ছা। তিন টাকা ক'রে সের। সওয়া সের আছে। আপনি কিসে ক'রে নেবেন ?"

অপ্রতিভ হ'য়ে পড়লেন খগেন সরখেল।

"না না, আপনার মুখের গ্রাস আমি কাড়ব কেন। আপনিই নিয়ে যান। আমি আর একদিন কিনব।"

তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দিলেন তিনি।

সদাশিব বেরিয়ে আসছিলেন এমন সময় সেই হাসিমুখী তরুণীটি অপাঙ্গে সলজ্জভাবে চাইলে তাঁর দিকে এবং মৃদুকণ্ঠে বললে—"বাবু—"

মনে প'ড়ে গেল সদাশিবের।

"হ্যাঁ, তোর জন্যে ওষুধ এনেছি। গাড়িতে আছে। চল, দিয়ে দিচ্ছি—রোজ তিনটে ক'রে খাবি।"

প্রতি মাসে 'মাসিক'এর সময় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে সে।

লজ্জায় অনেকদিন গোপন করেছিল। কিন্তু শেষে আর পারে নি। অনেকবার চোখ নীচু ক'রে অনেকবার ঘাড় ফিরিয়ে ব্যক্ত করেছে সদাশিবের কাছে।

মাছের বাজার থেকে বেরোবার মুখেই আবার থমকে দাঁড়াতে হ'ল সদাশিবকে। তিনি দেখলেন জগদম্বা জেলে চায়ের দোকান করেছে। চেহারাই বদলে গেছে তার। মাথায় টেড়ি, কানে বিড়ি গোঁজা। পরনে হাওয়াই শার্ট। চায়ের দোকানে সিনেমা অভিনেত্রীদের ছবি। একটা বড় কাচের 'জারে' রঙিন মাছ রেখেছে।

"কিরে জগদম্বা, মাছের ব্যবসা ছেড়ে দিলি ?"

"ওতে পোষায় না হুজুর। তাছাড়া বড় গন্‌দা (নোংরা) কাজ। রোজগার হয় না। সব লাভ পাইকার আর গুদামবালা টেনে নেয়।"

আবদুল মাছের হাঁড়ি নিয়ে সঙ্গে আসছিল। সে মৃদুকণ্ঠে বললে—"জগদম্বা চিরকালই একটু শৌখিন। বেশী পয়সা থাকলে ও আতরের দোকান খুলত।"

জগদম্বা এতে চটল না। আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে চেয়ে রইল আবদুলের দিকে। জগদম্বার বয়স বেশী নয়, ত্রিশের মধ্যেই। সদাশিবের মনে পড়ল কিছুদিন আগে তার বউ বাপের বাড়ি চ'লে গিয়েছিল আর ফেরে নি। সদাশিবের একবার ইচ্ছে হ'ল তার বউয়ের কথাটা জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু এত লোকের সামনে সেটা অশোভন হবে ভেবে আর করলেন না।

মোটরের কাছে কয়েকজন রোগী দাঁড়িয়েছিল। সদাশিব তাদের বললেন—"আজ বিকেলে হাটে যাব। সেইখানেই তোমরা যেও। এই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ভাল ক'রে দেখতে পারব না তোমাদের। এই ছিপলি তোর ওষুধ নিয়ে যা—"

সেই তরুণী মেয়েটি এসে ওষুধ নিয়ে গেল। মোটরের কাছে

আরও চার পাঁচটি ছেলে দাঁড়িয়েছিল। বয়স দশ থেকে বারোর মধ্যে। বাজারে ঝাঁকা মুটের কাজ করে। তাদের গায়ের জামা কাপড় ফরসা, মাথার চুল আঁচড়ানো। ঝাঁকা মুটেদের সাধারণতঃ এরকম হয় না। তারা হাসিমুখে সবাই সদাশিবকে সেলাম ক'রে ঘিরে দাঁড়াল।

"ও তোরা এসেছিস? বাঃ কাপড় জামা তো বেশ পরিষ্কার হয়েছে। দেখ্ তো, সাজিমাটিতে কেমন সুন্দর পরিষ্কার হয়। দেখি তোর দাঁত।"

সবাই তাদের দাঁত দেখাল। সদাশিব তাদের চোখও দেখলেন।

"ঠিক আছে - "

চারটি ক'রে পয়সা দিলেন প্রত্যেককে। তাছাড়া হাট থেকে যে কেঁদ্ আর কাগজের পাখী কিনেছিলেন তা-ও উপহার দিলেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শেখাবার জন্য সদাশিব এই ধরনের পুরস্কার ঘোষণা করেন মাঝে মাঝে। অতি সামান্যই খরচ হয় এতে, কিন্তু এর পরিবর্তে যে আনন্দ পান তা অসামান্য।

আলী এসে মৃদুকণ্ঠে বললে—"চারঠো মুরগি লিয়া হুজুর।"

"ভালো দেখে নিয়েছ তো?"

"জী হুজুর, সব তৈয়ার পাট্ঠা হ্যায়।"

মুরগিওলা রহমান বললে—"পছ্ছিম্ মু হোকে বোলতে হেঁ হুজুর, সব মুরগি আচ্ছা হ্যায়। খারাব হোনে সে জুতা মারিয়ে গা।"

সদাশিব হেসে বললেন—"যদি ঠকাও তোমার খোদাই তোমাকে জুতো মারবে। আমি কেন জুতো মারতে যাব তোমাকে শুধু শুধু—"

আলী বললে—"বেশক্।"

সদাশিব জিজ্ঞাসা করলেন—"মুরগির দাম কত?"

রহমান বললে সে পশ্চিমমুখে দাঁড়িয়ে 'কসম্' খেয়ে সত্যি কথা বলছে, সওয়া দু'টাকা ক'রে তার খরিদ, এখন হুজুরের যা মরজি।

আবতুল মাছের হাঁড়ি গাড়িতে তুলে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল একপাশে। সে আলীকে বললে, "ঘুরা দিজিয়ে মুরগি। দেড় দেড় রুপিয়া মে ইস্‌সে আচ্ছা মুরগি হাম লান্ দেঙ্গে।"

সদাশিব বললেন, "না না, গরীব মানুষের আমি লোকসান করাতে চাই না। ওই বলুক না কি হ'লে ওর পোষায়।"

রহমান মাথা চুলকে বললে—"হুজুরকা যেইসে মেহেরবানী। আপকা বাত সে বাহার হাম নেহি যাঙ্গে—"

শেষকালে এক টাকা দশ আনায় রফা হ'ল। রহমান দাম নিয়ে টাকাপয়সাগুলি তার কোমরে-বাঁধা গেঁজেতে পুরে শেষে বললে, মাস তুই থেকে তার ছোট ছেলের নাক দিয়ে রক্ত পড়ে, ডাক্তারবাবু যদি কোন দাবাই দেন গরীবের উপকার হয়।

"কোথা বাড়ি তোমার?"

"হবিগঞ্জ—"

"আমি তো হবিগঞ্জের হাটে যাই। সেইখানেই নিয়ে এস তোমার ছেলেকে। নাকটা দেখে ওষুধ দেব।"

মুরগিওলা রহমান সেলাম ক'রে বললে—"হুজুরকা মেহেরবানী। মুলাকাৎ করেঙ্গে হাটিয়ামে।"

সদাশিব বললেন—"আলী, চল এবার কমলবাবুর কারখানায়। কমলকে আজ খেতে বলব। আর গাড়ির কারবুরেটারটাও একবার দেখিয়ে নেব।"

"বহুত খু—"

কমলের কারখানায় ঢুকতেই কমলের উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল। "পাগল ক'রে দেবে আমাকে। এই মুন, আমার ড্রয়ার থেকে প্যাঁচকস্

কে নিয়েছে! কতবার মানা করেছি তোমাদের যে আমার ড্রয়ার থেকে প্যাঁচকস্ নিও না কেউ—"

সদাশিবকে দেখেই শান্ত হ'য়ে গেল কমল।

সদাশিব জিগ্যেস করলেন—"প্যাঁচকস্ হারালে না কি—"

"কেউ 'টপিয়ে' দিয়েছে। আসল পাকা স্টীলের জিনিস—"

কমলরা বিহারে চার পুরুষ ধরে' আছে। বিহারেই তার জন্ম। সুতরাং ভাষার মধ্যে অনেক হিন্দী কথা ঢুকে গেছে। তাই 'হাতিয়েছে' না বলে' 'টপিয়ে দিয়েছে' বললে।

"গাড়ি ঠিক চলছে তো?"

"মাঝে মাঝে হাঁচ্ছে। তাই মনে হচ্ছে 'কারবুরেটারে' ময়লা জমেছে বোধ হয়। তোমার কি সময় আছে এখন? খুলে দেখবে কি?"

"হ্যাঁ। এখনি করে' দিচ্ছি। এই ফালতু, ডাক্তারবাবুর গাড়ির 'কারবুরেটার'টা খোল্—"

ফালতুর আসল নাম তমিজুদ্দিন। কমল ওর নামকরণ করেছে 'ফালতু' কারণ যখন ও অ্যাপ্রেন্টিস্ হ'য়ে কারখানায় ঢুকেছিল তখন বাড়তি (extra) লোক হিসেবে নিয়েছিল ওকে কমল। ফালতুর বয়স ষোল সতরো। খুব রোগা আর লম্বা। যদিও সর্বাঙ্গে কালি-ঝুলি মাখা তবু বেশ বোঝা যায় যে ওর রং খুব ফরসা। মুখের মধ্যে একটা শিশু-সুলভ সারল্য, চোখ দুটিতে চাপা হাসি চিকমিক করছে সর্বদা। সে সোৎসাহে কারবুরেটার খুলতে লাগল। সে জানে এর জন্যে ডাক্তারবাবু কোন-না-কোন সময়ে তাকে কিছু দেবেন। মাস দুই আগে একটা হাফপ্যাণ্ট কিনে দিয়েছেন।…মুরগিগুলো ক্যাঁক্-ক্যাঁক্ করে' ডেকে উঠল কেরিয়ারের মধ্যে।

কমল হেসে জিগ্যেস করল—"কত করে' কিনলেন মুরগি—"

"ওহো, বলতেই ভুলে গেছি। তুমি আজ রাত্রে খেও আমার ওখানে।"

"আচ্ছা। আমার কিন্তু আজ যেতে রাত হবে একটু। সাড়ে ন'টা—"

"বেশ—"

"বসুন—"

চেয়ার এগিয়ে দিলে কমল।

"কাজকর্ম কেমন চলছে—"

"ভালই চলছে আপনার আশীর্বাদে—"

"হরেক রকমের গাড়ি তো অনেক জমিয়েছ দেখছি—"

"হ্যাঁ, তা জমেছে। কতকগুলো গাড়ি জমেই আছে। আর নড়ছে না—"

"কেন বল তো—"

কমল মুচকি হেসে' চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ তত্ত্বকথা ব'লে ফেলল।

"গাড়ির পিছনে যে মানুষ আছে তারই উপর নির্ভর করে সেটা। তারা গাড়ি না নিয়ে গেলে গাড়ি যাবে কি ক'রে!"

"নিচ্ছে না কেন—"

"ওই যে বড় বুইক্‌টা দেখছেন ওই যে কোণে রয়েছে, মাড্‌গার্ডটা টোল খাওয়া। ওর মালিকটি মাতাল চরিত্রহীন। তিনবার দেউলিয়া হয়েছে। গাড়ি চালিয়ে দুমকা থেকে আসছিল, একটা সাঁওতালকে ধাক্কা মেরে পালাচ্ছিল সেখান থেকে। পালাতে পালাতে আবার ধাক্কা খায় একটা গাছের সঙ্গে। তারপর রাত্তিরে আমার কাছে গাড়িটি রেখে সেই যে সরেছে আর তার পাত্তা নেই। কেউ বলছে বম্বে গেছে, কেউ বলছে দিল্লী। ওই যে ছোট্ট বেবি অস্টীনটা

দেখছেন ওটা মিস্ মরিসের। নিজেই ড্রাইভ করে আর সঙ্গে থাকে রোজ একজন ক'রে নূতন বন্ধু। একদিন রাত্রে মদ খেয়ে এক মাঠে পড়েছিল সমস্ত রাত। সকালে উঠে দেখে গাড়ির চাকাসুদ্ধ দুটো টায়ার চুরি হয়ে গেছে। গাড়িটা গরুর গাড়িতে চড়িয়ে আমার এখানে দিয়ে গেছে মাস তিনেক আগে। আর তার পাত্তা নেই। শুনছি বেবি অস্টিনের চাকা এখন এখানে পাওয়া যাবে না। বিলেত থেকে আনাতে হবে। ততদিন ও গাড়ি এখানেই প'ড়ে থাকবে—"

"আর ওই যে রং-ওঠা ঝরঝরে গাড়িটা রয়েছে, ওটা কে সারতে দিয়েছে ? ওর তো কিছুই নেই দেখছি—"

ওটার ইনজিন ঠিক আছে। আমি আড়াইশ' টাকায় কিনেছি। ভাল ক'রে সারিয়ে রং ক'রে আড়াই হাজার টাকায় বিক্রি করব। তখন ওর চেহারা দেখলে আর চিনতেই পারবেন না। বেশভূষার চটকে বুড়ো মানুষকে ছোকরা বানিয়ে দেব—"

মুচকি হেসে চেয়ে রইল কমল। সে হা-হা করে' হাসে না। মুচকি হাসে, কিন্তু বেশ বড় 'মুচকি', হাসিটা প্রায় কান পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে, সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটোও হাসতে থাকে।

ফালতু কারবুরেটার খুলে নিয়ে এল।

কমল কারবুরেটার নিয়ে পড়ল।

কারখানাতেও সদাশিবের রোগী জুটে গেল কয়েকটা। ইদ্‌রিস মিস্ত্রীর পায়ের নীচে একটা কড়া হয়েছে, বসতে গেলে লাগে। একটা অ্যাপ্রেন্টিস্ ছোঁড়ার হাঁপানি হচ্ছে। ফালতুর কসের দাঁতে ব্যথা হয়। সদাশিব হাঁ করিয়ে দেখলেন, কেরিজ হয়েছে। বুড়ো জগন মিস্ত্রীর বাত হয়েছে। ডান হাঁটুতে ব্যথা। সদাশিব ওষুধের বাক্স বার ক'রে ওষুধ দিতে লাগলেন সকলকে।

…চতুর্দিক প্রকম্পিত ক'রে একটা মোটর বাইক ঢুকল এসে।

তার থেকে নামলেন একজন 'খাকি' হাফপ্যাণ্ট-পরা বেঁটে মোটা লোক। বুলডগের মতো মুখ, হিট্‌লারি গোঁফ। মুখে সিগার। মিস্টার পরসাদ। বড় গভর্নমেণ্ট অফিসার একজন। নিরঙ্কুশ ব্যক্তি। প্রকাশ্যে ঘুষ নেন, প্রকাশ্যে অন্যায় কাজ করেন। এঁকে দেখে শশব্যস্ত হ'য়ে পড়ল কমল।

বলল—"কল্ আপকা গাড়ি দে দেংগে। থোড়া কাম্ বাকি হ্যায়—"

আদেশের কণ্ঠে মিস্টার পরসাদ বললেন—"জলদি কিজিয়ে। বড়া মুশ্‌কিল মে হ্যঁায়—"

"কল জরুর হো যায় গা—"

এমন সময় মিস্টার পরসাদের দৃষ্টি পড়ল ডাক্তারবাবুর উপর।

"নমস্তে নমস্তে। ডাক্‌টর সাহেব, আপ য়ঁহা কৈসে পোঁছ গ্যয়ে-

সদাশিব বাংলাতেই উত্তর দিলেন—"রিটায়ার ক'রে এইখানেই আছি। আপনি কবে এলেন এখানে?"

"এক মাহিনা—"

ওঁদের নিম্নলিখিতরূপ আলাপ হ'ল। মিস্টার পরসাদের হিন্দীটা বাংলায় অনুবাদ ক'রে দিচ্ছি।

"আপনি এখানেই প্র্যাক্‌টিস্ করছেন?"

"কি আর করি, কিছু তো একটা করতে হবে—"

"আপনার ঋণ কখনও শোধ করতে পারব না। ভাগ্যে আপনি ছিলেন তাই বেঁচে গিয়েছিলাম—"

"কি হয়েছিল আপনার বলুন তো, ঠিক মনে নেই—"

"স্ট্র্যাংগুলেটেড্ হার্নিয়া। আপনি তখন ছাপরায়, আমিও ছাপরায়। আপনি না থাকলে আমি খতম হ'য়ে যেতাম। আপনি

চ'লে আসবার পর ডক্‌টর ঘোষ এলেন। তিনি চৌবেজির হাইড্রোসিল অপারেশন করলেন। সেপ্‌টিক হ'য়ে মারা গেলেন ভদ্রলোক—"

"দেখুন, বাঁচাবার বা মারবার মালিক আমরা নই। আমরা সকলেই ভালো করবার চেষ্টা করি, কেউ হয়, কেউ হয় না। ওপরওলার মর্জিতে সব হয়—"

"সে কথা আমি মানব না। সব ডাক্তারের বিদ্যেও সমান নয়, সবাই সমান যত্নও নেয় না। আপনি এখানে আছেন জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। কোথায় বাসা আপনার ?"

"কমল আমার বাড়ি চেনে—"

"আচ্ছা, এখন চলি। এই রোদে মোটর বাইকে ক'রে ঘুরতে হচ্ছে। চলি, নমস্কার—"

চ'লে গেলেন মিস্টার পরসাদ।

উদ্ভাসিত মুখে এগিয়ে এল কমল।

"আপনার সঙ্গে খুব খাতির আছে দেখছি। আমার একটু উপকার করবেন ?"

"কি বল—"

"গভর্নমেণ্টের কাছে আমার পনর হাজার টাকার বিল বাকি আছে। দু'বছর হ'য়ে গেল, কিছুতেই আদায় করতে পারছি না। চিঠি লিখে লিখে হয়রান হ'য়ে গেছি, উত্তর পাই না। আপিসে গিয়ে তদ্বির করলুম, দু'একটা ক্লার্ককে ঘুষও দিলুম, কিন্তু কিছু হ'চ্ছে না। কানাঘুষো শুনছি ওপরওলাকেও নাকি কিছু সেলামী দিতে হবে। মিস্টার পরসাদের খুব ইনফ্লুয়েন্স, উনি যদি চেষ্টা করেন এখনই পেয়ে যাব টাকাটা। এর আগে ওঁর গাড়ি একবার সারিয়ে দিয়েছি, একটি পয়সা চার্জ করি নি। এবারও করব না। এইবার ওঁকে বলব ভেবেছিলাম কথাটা। আপনি যদি ব'লে দেন তাহলে আরও ভালো হয়—"

"আচ্ছা বলব -- "

কমল যত্ন ক'রে কারবুরেটারটা পরিষ্কার ক'রে ফিট ক'রে দিলে।

"আজ রাত্রে যেও মনে ক'রে—"

"যাব --"

সদাশিব নিজের হাতঘড়িটা দেখলেন। দেড়টা বেজে গেছে। বাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন তিনি।

সাত

সদাশিব ডাক্তারের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল একটা প্রকাণ্ড মাঠের মাঝখানে, প্রকাণ্ড একটা গাছের ছায়ায়। এখান থেকে মাইলখানেক দূরে হাজিপুর হাট। বেলা দুটো বেজেছে। হাট তিনটের আগে বসে না। সদাশিব নির্জনে একটু বিশ্রাম ক'রে নিচ্ছেন। নির্জন প্রকৃতির কোলে মাঝে মাঝে একা ব'সে থাকতে ভালবাসেন তিনি।

আলীকে পাঠিয়েছেন গ্রামের ভিতর একটু টাটকা দুধ সংগ্রহ করবার জন্য। সঙ্গে কন্‌ডেন্সড্ মিল্‌ক্ ছিল, তবু পাঠিয়েছেন। আসল উদ্দেশ্য আলীকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। কাছে কোন লোক থাকলে তাঁর চিন্তাধারা বিঘ্নিত হয়। স্রোতে লোকে যেমন নৌকো ছেড়ে দেয় তাঁর মনকেও তেমনি ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ নানা জায়গায় ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে সে। সামনে কয়েকটা খঞ্জন ল্যাজ দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা নীলকণ্ঠ ছোট্ট একটা গাছের ডালে ব'সে 'টক্' 'টক্' ক'রে শব্দ করছে মাঝে মাঝে। একটু দূরে গরু ভেড়া ছাগল চরছে। একটা গরুর পিঠে ফিঙে

পাখী ব'সে আছে। লঘু সাদা মেঘ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে। এলোমেলো হাওয়া বইছে। দোয়েল পাখীর তীক্ষ্ণ মধুর কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে দূর থেকে। সদাশিব উঠে নিজের ডায়েরিটা বার ক'রে আনলেন। তারপর ফোল্‌ডিং টেবিল চেয়ারটাও বার ক'রে পাতলেন। একটু ভেবে লিখতে শুরু করলেন তিনি।

"দেখতে দেখতে এখানে অনেকদিন কেটে গেল। দিন কত শীঘ্র কেটে যায়। মনে হচ্ছে এই সেদিন এসেছি। সকালের পর সন্ধ্যা, তারপর আবার সকাল। কালের প্রবাহ ব'য়ে চলেছে অবিরাম গতিতে। দেখতে দেখতে পাঁচ বছর কেটে গেল।

"প্রথমে যখন এখানে জীবন আরম্ভ করেছিলাম তখন আশঙ্কা হয়েছিল সময় কাটবে কি না, মনের অবলম্বন পাব কি না, মনের মধ্যে যে স্নেহের কাঙাল ক্ষুধিত হ'য়ে ব'সে আছে সে তার আকাঙ্ক্ষিত সুধা পাবে কি না। আজ নিঃসংশয়ে বলতে পারি আমার সে আশঙ্কা অপনোদিত হয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার অবসর নেই। মনের যে অবলম্বন পেয়েছি তার চেয়ে বড় অবলম্বন আমার পক্ষে পাওয়া সম্ভব ছিল না। আমি প্রচলিত-অর্থে 'ধার্মিক' হই নি, রাজনীতি বা সমাজনীতি আলোচনার ছুতোয় পরনিন্দা করি নি, লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট কুড়িয়ে 'নেতা' হই নি, আমি যা ছিলাম তাই আছি, যে পথে এতদিন চ'লে এসেছি সেই পথই ধ'রে আছি। তার থেকে বিচ্যুত হই নি। বরাবর ডাক্তারি করেছি, এখনও তাই করছি। অন্য কিছু হবার শখ হয় নি আমার। সাধ্যও নেই। এক হিসাবে গীতার নির্দেশই পালন করেছি, 'স্বধর্ম'কেই আঁকড়ে আছি। স্নেহের কাঙাল আমার মনও পরিতৃপ্ত হয়েছে। যে অপরিমেয় সুধা সে পেয়েছে তা তার কল্পনার অতীত ছিল। আমি মহাপুরুষ নই, অত্যন্ত সাধারণ লোক আমি। আমি কি ক'রে এত

লোকের শ্রদ্ধা, ভালবাসা, স্নেহ আকর্ষণ করতে পেরেছি? ভাবলেও অবাক লাগে।

"অনেকে হয়তো মনে করবেন আমি অসুখে বিসুখে ওদের চিকিৎসা করি বলেই ওরা আমাকে ভালবাসে। বাইরে থেকে বিচার করলে তাই মনে হয় কিন্তু আসল কারণ বোধ হয় তা নয়। এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়, জমিদারবাবু নওলকিশোর প্রতি রবিবারে ভিখারীদের চাল দেন, বেঙ্কট শর্মার ঠাকুরবাড়িতে প্রত্যহ তৃষিতদের জল আর ছোলা-গুড় দেওয়া হয়। জনসাধারণ কি এদের ভালবাসে? কেউ কেউ হয়তো শ্রদ্ধা করে, কিন্তু আমার বিশ্বাস ভালবাসে না। ঘনিষ্ঠ না হ'লে ভালবাসা যায় না। আমরা পোষা কুকুর বিড়ালকে যত ভালবাসি দূরবর্তী মহৎ লোককেও ততটা বাসি না। আমি ওদের উপকার করেছি বলেই যে ওরা আমাকে ভালবাসে তা নয়, আমি ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি বলেই ভালবাসে। আমার যারা রক্তসম্পর্কিত, সমাজের খাতায় যারা আমার আত্মীয় ব'লে চিহ্নিত, তাদের সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক নেই, কারণ তারা দূরে থাকে, ক্বচিৎ তাদের সঙ্গে দেখা হয়। তারা পর হ'য়ে গেছে। আবদুল, আলী, ভগলু, কেব্‌লি, ফালতু, রহমান, কমল, জগদম্বা, সুখীয়া, বিলাতী সাহ এবং আরও অনেক নগণ্য লোক আজ আত্মীয় হয়েছে আমার। ওদের সুখদুঃখের সঙ্গে আমি জড়িত, তাই আমাকে ওরা আপন লোক মনে করে। আমি পরম সুখে আছি।

"কেবল একটা ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়েছি একটু। মালতীর হিষ্টিরিয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে ফিট্‌ হচ্ছে। একদিন বাড়ি ফিরে দেখি কাঁদছে। কেন কাঁদছে তা বললে না। আমাকে দেখে চোখ মুছে অন্য ঘরে চ'লে গেল। আজবলাল বলছিল প্রায় নাকি অকারণে

কাঁদে। অকারণে চটেও যায়। আজবলাল ওর নাম দিয়েছে পাগলী। আমি কিন্তু বুঝতে পারছি কি হয়েছে। বাঁজা মেয়েদের এরকম হয়। সন্তান-পালনের অন্তর্নিহিত কামনা স্বাভাবিক পথে চরিতার্থ না হ'লে নানা অস্বাভাবিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ওকে একটা কাবুলী বিড়াল, একটা টিয়াপাখী, একজোড়া খরগোশ কিনে দিয়েছি। কিন্তু দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে? ওর যদি একটা ছেলে হ'ত!"...

এই পর্যন্ত লিখেই লেখা বন্ধ করতে হ'ল সদাশিবকে। কারণ তিনি দেখতে পেলেন আলী একটা বাছুরের গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে আনছে আর তার পিছনে আসছে একটা গাই আর তার পিছনে হলদে শাড়ি-পরা একটা মেয়ে। কাছে আসতেই গীতাকে চিনতে পারলেন তিনি। গোয়ালার মেয়ে। বাপ-মা নাম রেখেছিল গিতিয়া। কিন্তু কাছেই যে মিশনারী স্কুলটা আছে তাতে গিতিয়া পড়েছিল ছেলেবেলায়। সেই স্কুলের মেমসাহেব তার নাম গিতিয়া বদলে গীতা ক'রে দিয়েছেন। গীতা স্কুলে আর পড়ে না। অনেকদিন হ'ল বিয়ে হ'য়ে গেছে তার। যখন তার দশ বছর বয়স তখনই। সম্প্রতি দ্বিরাগমন হয়েছে। চমৎকার বাংলা বলতে পারে গীতা।

"গীতা, কবে শ্বশুরবাড়ি থেকে এলি?"

"পরশু—"

"আমার জন্যে সামান্য দুধ দিলেই তো হ'ত। একটু চায়ের জন্যে দরকার খালি। তুই একেবারে গাই নিয়ে হাজির হলি কেন?"

"আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে—"

চমৎকার চকচকে একটি কাঁসার ঘটিও এনেছিল সে। তাইতে নিজেই দুধ দুয়ে আলীর হাতে দিতেই আলী হাতের তর্জনী উত্তোলন ক'রে বললে—"ঠহর যাও এক মিনিট—"। কেরিয়ার থেকে বার

করলে সে অ্যালুমিনিয়মের একটা মুখ-ঢাকা হাঁড়ি। তাইতেই দুধটা ঢেলে নিয়ে সদাশিবের দিকে একটু ঝুঁকে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলে—"চায় কা পানি চঢ়া দেঁ হুজুর ?"

"দাও। গীতা চা খাবি ?"

গীতা লজ্জিত হ'ল।

"আলী, গাড়িতে বেশি গ্লাস আছে ?"

"জি হুজুর হ্যায়। মগর থোড়া সা চন্‌কা হুয়া—"

আলী তর্জনী আর অঙ্গুষ্ঠের একটি ছোট্ট মুদ্রা ক'রে জানিয়ে দিলে যে গ্লাসটা সামান্য ফাটা।

"ওতেই গীতাকে চা দাও। তুমিও এক কাপ বানাও নিজের জন্যে।"

"বহুত খু—"

মাঠের মধ্যে স্টোভ জ্বালা সহজসাধ্য নয়। এলেমেলো হাওয়ার জন্যে সহজে ধরতে চায় না। কিন্তু সদাশিবের মোটরে সব ব্যবস্থা আছে। বড় বড় টিনের পাত দিয়ে ছোট একটা টিনের ঘর মতো ক'রে নিলে আলী। তার ভিতর স্টোভটা ঢুকিয়ে জ্বালতে লাগল।

গীতা সদাশিবের কাছে স'রে এসে মৃদুকণ্ঠে তার দুঃখের কাহিনী বলতে লাগল। গীতা শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। তার স্বামী দুশ্চরিত্র, মাতাল। শাশুড়ী দজ্জাল। তিনটি ননদ আছে, তিনটিই হাড়-জ্বালানী। কেউ শ্বশুরঘর করে না। সব মায়ের কাছে আছে। শুধু তারা নয়, তাদের স্বামীরা এবং ছেলে-পিলেরাও। গীতাকেই সকলের সেবা করতে হয়। পান থেকে চুন খসলেই মার-ধোর করে। একদিন এমন ইঁট ছুঁড়েছিল যে মাথা কেটে গিয়েছিল তার। তাছাড়া তাকে তার স্বামীর মালিকের বাড়িতেও কাজ করতে হয়।

"তোর স্বামী কি করে ?"

"একজন বাভনের জমি চষে। এক পয়সা মাইনে পায় না। কবে নাকি দু'শো টাকা ধার নিয়েছিল তারই সুদের সুদ জমছে। খেটে শোধ করতে হবে—"

"তোদের চলে কি করে ?"

"ওই জমি থেকে যা ফসল হয় তাই দেয় আমাদের খাবার মতো। তার দামও হিসেব ক'রে ধারে জমা করে। ও ধার জীবনে কখনও শোধ হবে না—"

এই একই কাহিনী সদাশিব অনেকের মুখ থেকে শুনেছেন। বার-বার অনুভব করেছেন যে দাসত্ব-প্রথা এখনও লোপ পায় নি। কেবল তার বাইরের রূপটা বদলেছে মাত্র। দাস-দাসী বিক্রয়ের আলাদা হাট-বাজার নেই আজকাল। সমাজের বুকের উপরই ঘরে ঘরে সে হাট বসেছে। ধূর্ত ধনীর কাছে অসহায় দুর্বলরা স্বেচ্ছায় আত্মবিক্রয় করছে। না ক'রে উপায় নেই তাদের।

সদাশিব জিগ্যেস করলেন—"আমি কি করতে পারি—"

গীতা বললে—"দু' একদিন পরেই আমার স্বামী আমাকে নিতে আসবে। আমি যদি যেতে না চাই আমাকে সেই বাভন লোকজন পাঠিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাবে। এখন ছোলা উঠেছে, আমাকে দিয়ে সেই ছোলা মণ মণ পেষাবে আর ছাতু করাবে। আমি তা পারব না। আমার স্বামী এলেই আমি আপনার কাছে পালিয়ে যাব। আপনি বলবেন আমি ওকে চাকরানী রেখেছি, ওকে যেতে দেব না।"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে সদাশিব বললেন, "সেটা কি ঠিক হবে ? কারও স্ত্রীকে কি তার স্বামীর কাছ থেকে কেউ জোর ক'রে সরিয়ে আনতে পারে ? সেটা বে-আইনী হবে। তুমি যদি তোমার স্বামীর কাছে না থাকতে চাও তাহলে আদালতের সাহায্যে বিয়ে ভেঙে দিতে

হবে। সে অনেক ঝঞ্ঝাট। তার চেয়ে এক কাজ কর, তোমার স্বামীকেও এই শহরে এনে কোন রোজগারের কাজে লাগিয়ে দাও, তুমিও কাজ কর।"

"কিন্তু সেই বাভন তার টাকা ছাড়বে কেন? নালিশ করবে—"

তার টাকা শোধ ক'রে দাও। সে নালিশ করুক, আদালতের বিচারে তার যে টাকা পাওনা হবে তা আমরা দিয়ে দেব।"

"কিন্তু কি করে' দেব অত টাকা। আপনি তো জানেন আমরা কত গরীব। বাবা অন্ধ, মা শুষছে, ভাইটা তাড়িখোর, সপ্তাহের মধ্যে তিন দিন কাজ করে না। আমরা কি করে' অত টাকা শোধ করব?"

"আচ্ছা সে একটা ব্যবস্থা হবে'খন"

"হবে?"

উৎসুক দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল গীতা সদাশিবের মুখের দিকে। সে জানে সদাশিব যদি ভরসা দেয় তাহলে হবেই একটা কিছু।

"হবে, তোর স্বামী এলে নিয়ে আসিস তাকে আমার কাছে—"

গীতা হঠাৎ হাঁটু গেড়ে প্রণাম করলে সদাশিবকে। তারপর মোটরের পিছনে বসে' চা খেয়ে গরু নিয়ে চলে' গেল। মনের ভাব হালকা হ'য়ে গেল তার।

হাজিপুর হাটের কাছে সেই গাছের ছায়ায় বসে' সদাশিব যথারীতি রোগী দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন ভিড়ের মধ্যে কেবলি দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখের দৃষ্টি শঙ্কিত।

"কি হ'ল কেবলি? নারান ছাড়া পেয়েছে?"

"না বাবু। তাকে জেলে আটকে রেখেছে। আমি কাল দেখতে

গিয়েছিলাম, অমন জোয়ান মরদ, মেয়েমানুষের মতো হাউ হাউ করে' কাঁদছে। আপনি একটা ব্যবস্থা করুন ডাক্তারবাবু। আপনিই তো আমাদের মা বাপ।"

কেব্‌লির ছেকা-ছেনি হিন্দীতে উক্ত উক্তিটি শুনে গম্ভীর হ'য়ে গেলেন সদাশিব।

"আচ্ছা তুই বাড়ি যা, দেখি আমি কি করতে পারি।"

কেবলি ময়লা আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে চলে' গেল। সদাশিব রোগী দেখতে লাগলেন। ভিড়ের পিছন দিকে একটা কলরব উঠল। সদাশিব দেখলেন শুকুর কশাই তার ছেলে সিদ্দিককে টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

"আদাব। বংগট্ কো পকড়কে লায়ে হ্যঁায় ডাক্‌টার সাব।"

বংগট্ মানে পাজি।

সদাশিব চেয়ার ছেড়ে উঠলেন এবং সিদ্দিকের গালে ঠাস্ ঠাস্ করে' ছুটো চড় মারলেন জোরে।

শুকুর চীৎকার করে' উঠল—"আউর মারিয়ে, আউর মারিয়ে—"

সদাশিব কিন্তু আর মারলেন না, চেয়ারে এসে বসলেন। তারপর বললেন "উস্‌কো বৈঠাকে রাখ্‌খো স্থই দেঙ্গে—"

সিদ্দিকের বয়স সতরো আঠারো বছর। গনোরিয়া হয়েছে। শুকুর তাকে সদাশিবের কাছে নিয়ে আসতে চেয়েছিল কিন্তু সিদ্দিক রাজী হয় নি। সে বলেছিল উনি তো 'ভিক্‌মাংগা'-দের (ভিখারীদের) ডাক্তার। উনি আবার চিকিৎসার জানেন কি? শুকুরের কিন্তু সদাশিবের উপর অগাধ বিশ্বাস। তার সিফিলিস সদাশিবই সারিয়েছেন। শুকুর এসে সদাশিবকে জানিয়েছিল তার কুপুত্র সিদ্দিক সদাশিবের সম্বন্ধে কি অভদ্র উক্তি করেছে। সদাশিব প্রথমে কোন উত্তরই দেন নি। কিন্তু শুকুর না-ছোড়।

"অব্ কুছ্ রাস্তা বাত্‌লাইয়ে হুজুর। ক্যা কিয়া যায়?"

"ওকে এখানে ধরে' নিয়ে এস। আমি ব্যবস্থা করে' দিচ্ছি—"

দুটি প্রচণ্ড চড় খেয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে গিয়েছিল সিদ্দিক। সদাশিব যখন তাকে ইন্‌জেক্‌শন দিলেন তখন আর আপত্তি করল না সে। সদাশিব বললেন—"এ ইন্‌জেক্‌শন রোজ নিতে হবে। দশ দিন। আর এ ওষুধ খাও। রোজ তিনটে করে' ট্যাবলেট—"

শুকুর বললে—"কাল বাজারেই কি ইন্‌জেক্‌শন দেবেন?"

"তা দিতে পারি। ভোরে ৭টার আগে যদি আমার বাড়িতে আসে তাহলে বাড়িতেও দিতে পারি।"

শুকুর আদাব করে' সিদ্দিককে নিয়ে চলে' গেল।

সদাশিব অন্যান্য রোগীদের ব্যবস্থা করে' দিয়ে হাটে ঢুকলেন। কিছু কিনলেন। সেই কুমড়ো-উলী বুড়ী বসেছিল। তার পাশে বসেছিল তার নাতনী রৌশন। বিয়ে হ'য়ে তার চেহারাই বদলে গেছে। সে উঠে এসে সদাশিবকে প্রণাম করল। সদাশিব তার মাথায় হাত দিয়ে আদর করলেন একটু। তারপর এগিয়ে গেলেন বিলাতী সাহের দোকানের দিকে।

"দু'মণ কাতারনী চাল আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। খুব ভাল চাল—"

"দাম কত—"

"আমি বিয়াল্লিশ টাকা মণ খরিদ করেছি। এখন আপনি যা দেন—"

এবড়োখেবড়ো হলদে দাঁত বার করে' হাসলে বিলাতী সাহ।

"বেশী ভনিতা কোরো না। কত দেব বল—"

"এক টাকা মণ লাভ দিন।"

"আমার গাড়ির কাছে চল, চেক দিয়ে দিচ্ছি।"

"চেক ভাঙানো বড় হাঙ্গামা ডাক্তারবাবু আমি পরে গিয়ে আপনার বাড়ি থেকে দাম নিয়ে আসব।"

"বেশ।"

গাড়ির কাছে এসে দেখলেন একটা জেলে একটা রুই মাছ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"আমার ছেলে ভাল হ'য়ে গেছে বাবু। আপনাকে তো কিছু দিতে পারি নি, তাই এই মাছটা—"

"ভাল হ'য়ে গেছে? বাঃ! আমাকে কিছু দিতে হবে না। এই মাছটা বেচে তোর ছেলেকে একটা তাগদের ওষুধ খাওয়া। আমি লিখে দিচ্ছি—"

একটা কাগজে ওষুধের নাম লিখে দিলেন তিনি। জেলেটা তবু কুণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

"কি রে দাঁড়িয়ে আছিস কেন—"

"এ মাছটা আপনি নিয়ে যান। আপনার নাম করে' এনেছি। এ আমি বেচব না। আমার ছেলেকে তাগদের দাবাই আমি কিনে দেব—"

বোমার মতো ফেটে পড়লেন সদাশিব।

"এই নবাবী আর লৌকিকতা করেই উচ্ছন্ন গেছ তোমরা। দাও তোমাকে আর ওষুধ কিনতে হবে না। আমিই এনে দেব।"

তার হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে মোটরে উঠে পড়লেন সদাশিব। আলী গোপনে মাছটি 'কেরিয়ারে' রেখে দিলে। জেলেটা সদাশিবকে কি বলতে যাচ্ছিল। আলী ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে ইশারায় জানিয়ে দিলে—একটি কথা বোলো না এখন।

হাজিপুরের হাট থেকে সদাশিব সোজা চলে' গেলেন ডি· আই· জি·

অব পুলিসের বাড়িতে। যিনি এখন এই পদে অধিষ্ঠিত তাঁর সঙ্গে সদাশিবের আলাপ ছিল চাকরিজীবনে। তখন তিনি এস. পি. ছিলেন। সদাশিব এখন পারতপক্ষে অফিসারদের এড়িয়ে চলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল ইনি তাঁকে চিনতে পারবেন কি না। প্রায় দশ বছর পরে দেখা হচ্ছে। যদি চিনতে না পারেন, যদি তাঁর কথা না রাখেন, তাহলে বড়ই মর্মান্তিক ব্যাপার হবে। তবু গেলেন তিনি। কেবলির অশ্রুপ্লাবিত মুখটা বড়ই পীড়া দিচ্ছিল তাঁকে।...

ডি. আই. জি. প্রথমে তাঁকে সত্যিই চিনতে পারেন নি। কিন্তু পরিচয় দিতেই চিনতে পারলেন এবং সাদর অভ্যর্থনা ক'রে বসালেন।

"বসুন, বসুন। আপনার চেহারাটা একটু বদলে গেছে। তাই চিনতে দেরি হ'ল। রিটায়ার ক'রে এখানেই প্র্যাকটিস করছেন?"

"হ্যাঁ—"

"কই আপনার কথা শুনিনি তো—"

"আমি যাদের মধ্যে প্র্যাকটিস করি তারা আপনাদের কাছে আসতে পারে না। ইতর লোকেদের ডাক্তার আমি—"

"ওরাই তো এখন দেশের মালিক সার। ওদের এখন আর অবজ্ঞা করবার জো নেই।"

"কিন্তু তবু ওদের সম্বন্ধে এখনও আপনারা সুবিচার করছেন না। ওদেরই একজনের জন্য আজ আপনার কাছে দরবার করতে এসেছি।"

"কি ব্যাপার!"

সদাশিব খুলে বললেন সব।

"ও, এই! আচ্ছা, আজই ছাড়া পেয়ে যাবে। আমি এখনই ব্যবস্থা করে' দিচ্ছি।"

ফোন তুলে তিনি এস. পি.কে বললেন ব্যাপারটা। এস. পি. কি বলছিলেন তা শুনতে পেলেন না সদাশিব। ডি.আই.জি. বললেন, "যেমন

ক'রে হোক ওকে ছেড়ে দিতে হবে। ছবিলালবাবুর চক্রান্তে নির্দোষ বেচারা কষ্ট পাচ্ছে। ওকে আজই ছেড়ে দিন। আচ্ছা, আচ্ছা—"

ডি. আই. জি. সদাশিবের দিকে চেয়ে বললেন—"আজই ছাড়া পাবে। আজ না পায়, কাল পাবেই। বয়- "

লিভেরি-পরা 'বয়' দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াতেই তিনি বললেন—"হুইস্কি-সোডা।"

তারপর সদাশিবের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন।

"আপনার চলবে কি ?"

"না, আমি ও রসে বঞ্চিত।"

ডি. আই. জি. আর একবার হাসলেন।

"আপনার খদ্দর দেখে আমার বোঝা উচিত ছিল। যদিও আজকাল অনেক খদ্দরধারীরাও এ রসের রসিক হয়েছেন—"

"তা জানি। খদ্দর আজকাল অনেক পাজি লোকেদের ইউনিফর্ম হয়েছে।"

"তবে পরেন কেন ?"

"ওর পিছনে একটা বড় আদর্শ আছে ব'লে। পাজিরা ভাত খায় জুতো পরে ব'লে তো ভাত খাওয়া জুতো পরা ছাড়তে পারি না— "

হা হা ক'রে হেসে উঠলেন ডি. আই. জি.।

"ওয়েল সেড্। আসবেন মাঝে মাঝে। নমস্কার।"

"নমস্কার।"

সদাশিব বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু ফিরে এলেন আবার।

"একটা যদি প্রস্তাব করি, রাগ করবেন ?"

"কি বলুন—"

"একটু আগেই আমার এক জেলে রুগী বড় একটা রুই মাছ উপহার দিয়েছে। মাছটা নিয়ে সমস্যায় পড়েছি। আমি বিপত্নীক।

বাড়িতে খাবার লোক বেশী নেই। ঠাকুরটা অসুখে পড়েছে। এই অসময়ে যদি মাছ নিয়ে যাই আমার ভাইপো বউ মালতী চ'টে যাবে। মাছটা যদি আপনাকে দিয়ে যাই, কেমন হয়?"

"এককালে ঘুষ নিতাম, এখন আর নিই না। তবে এতে যদি আপনার সমস্যার সমাধান হয় দিয়ে যেতে পারেন।"

আবার উচ্চকণ্ঠে হাসলেন তিনি।

তাঁকে মাছটা দিয়ে চ'লে গেলেন সদাশিব।

আট

সেদিন বাজারে ঢুকেই সদাশিব দেখলেন বাঁড়ুয্যে মশাই একগাদা ছোট মাছের সামনে ব'সে সেই গাদার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কুঁচো চিংড়ি বাছছেন। বাঁড়ুয্যে মশায়ের বয়স কত তা বলা শক্ত। জরাজীর্ণ চেহারা। মাথায় চুল প্রায় নেই, যে ক'গাছি আছে তা পাকা। ঝোলা গোঁফ, তাও পাকা। রোগা সরু মুখ। চক্ষু কোটরগত, দৃষ্টি নিষ্প্রভ। ডান দিকের পাকা ভুরুর মাঝখানে একটা কালো আঁচিল তাঁর জরা-লাঞ্ছিত মুখের মধ্যে নির্জর হ'য়ে আছে। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। নিকেলের, একধারে সুতো দিয়ে বাঁধা। বাঁড়ুয্যে মশাই কারো দিকে তাকান না, তন্ময় হ'য়ে মাছ ঘাঁটেন। চারদিকে জল, কাদা প্যাচপ্যাচ করছে, লোকের ভিড় গিজ্‌গিজ্‌ করছে, কিন্তু সেদিকে বাঁড়ুয্যে মশায়ের লক্ষ্য নেই। তিনি ওই জলকাদার উপর উবু হ'য়ে ব'সে বহু লোকের পায়ের এবং হাঁটুর গুঁতো সহ্য ক'রে কুঁচো চিংড়ি সংগ্রহ করছেন। আধপোয়ার বেশী কিনবেন না, কিন্তু মাছ ঘাঁটবেন অনেকক্ষণ ধ'রে। ওতেই আনন্দ।

"নমস্কার বাঁড়ুয্যে মশাই। কি মাছ কিনছেন—"

বাঁড়ুয্যে মশাই ঘাড় তুললেন না। স্বর শুনেই সদাশিবকে চিনতে পারলেন।

"কে, ডাক্তারবাবু, নমস্কার। কুঁচো চিংড়ি কিনছি। বেগুনও কিনেছি কিছু। নাতনী বলেছে বেগুন দিয়ে কুঁচো চিংড়ি রেঁধে দেবে। বেশ রাঁধে।"

"কত ক'রে দর—"

"এক টাকা। এই পোকার মতো মাছ বলে কিনা এক টাকা! বাজারে কোন জিনিসে কি হাত দেবার জো আছে। সব আগুন!"

ঘাড় না তুলেই কথাগুলি ব'লে গেলেন।

বাঁড়ুয্যে মশাই রোজ বাজারে আসেন। রোজ ওই ছোট ছোট মাছের স্তূপের ভিতর হাত চালিয়ে চালিয়ে নিজের পছন্দ মতো মাছ বার করেন। কোন দিন কুঁচো চিংড়ি, কোন দিন মৌরলা, কোন দিন খয়রা, কোন দিন ছোট পুঁটি। আধপোর বেশী কেনেন না কোন দিন। কোন্ মাছের সঙ্গে কোন্ মসলা দিলে মুখরোচক তরকারি হয় তা তাঁর নখদর্পণে। এঁকে দেখলেই সদাশিবের মনে হয় নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের প্রতীক ইনি। খাদ্য-রসিক, কিন্তু দারিদ্র্যপীড়িত। আত্মসম্মান-বোধ খুব প্রবল। কারো কাছে মাথা নত করতে চান না, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার তাড়নায় মাঝে মাঝে করতে হয় ব'লে মরমে ম'রে থাকেন।

জেলেরা ওঁকে খুব খাতির করে। উনি এখানকার স্কুলে অনেকদিন শিক্ষকতা ক'রে এখন রিটায়ার করেছেন। একমাত্র পুত্রটি অকালে মারা গেছে। তারই মেয়ে ওঁর দেখাশোনা করে। পুত্রবধূও নেই।

"আপনার নাতনীর রান্নার সুখ্যাতি আমিও শুনেছি। একদিন গিয়ে তার হাতের বেগুন-চিংড়ি খেয়ে আসব—"

"যাবেন, যাবেন। সে তো আমার পরম সৌভাগ্য—"

সদাশিব মাংসের দোকানের দিকে গেলেন। আগের দিন রহমন কশাই খবর দিয়ে গিয়েছিল যে সে ভাল ভেড়া কাটবে একটা। ভেড়ার মাংস এ অঞ্চলে দুর্লভ। ছাগলই বেশী পছন্দ করে এদেশের লোক। কশাইরা সবাই জানে ডাক্তারবাবু ভেড়ার মাংস ভালবাসেন, তাই ভেড়া কাটলেই খবর দিয়ে আসে তাঁকে।

রহমনের কাছে যেতেই রহমন তাঁকে বলল—"হুজুরের জন্য একটা 'লেগ' আলাদা ক'রে রেখেছি—"

"ওজন কর—"

ওজনে আড়াই সের হ'ল। বেশ চর্বিদার 'মাটন', দেখে খুশী হলেন সদাশিব। ভাল রোস্ট হবে। তিনি দামটা মিটিয়ে দিয়ে ফিরেই দেখতে পেলেন খগেন সরখেলকে। লুব্ধদৃষ্টিতে 'মাটন লেগ'-টার দিকে চেয়ে আছেন।

"আপনি কিনলেন বুঝি ওটা? বড্ড বেশী চর্বি। তা না হ'লে আমিও নিতুম সের দুই। আপনি পুরো 'লেগ'-টাই নিলেন? আপনার এ বয়সে অত চর্বি খাওয়া কি ভালো?" পরমুহূর্তেই অপ্রস্তুত মুখে বললেন—"ও আপনি তো নিজেই ডাক্তার।" বলেই সুট ক'রে চ'লে গেলেন তিনি মাছের বাজারের দিকে।

"সেলাম হুজুর—"

সদাশিব ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন সিতাবী মেথর। তিনি যখন হাসপাতালে চাকরি করতেন তখন এ-ও ছিল সেখানে। এখনও আছে। সিতাবী এক সের 'মাটন' কিনলে। সদাশিব আন্দাজ করলেন আজ সন্ধ্যায় ওদের তাড়ির আসর ভালো করে' জমবে। আর একটা কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল তাঁর। এই মেথররা খায় ভালো। কারণ মেথরদের প্রত্যেকেই কাজ করে। সিতাবীর পরিবারে বউ

ছেলে মেয়ে নিয়ে পাঁচ-ছ'জন লোক। সকলেই রোজগার করে। ওদের সকলের আয় যোগ করলে মাসে আড়াইশ' তিনশ' টাকা হবে। সদাশিব ভাবলেন, তাই সিতাবী স্বচ্ছন্দে তিন টাকা খরচ ক'রে মাটন কিনতে পারল। কিন্তু খগেন সরখেল পারলেন না। তাঁর মাইনে মাত্র একশ' টাকা। একঘর ছেলে-মেয়ে। দু'টি মেয়ে বিবাহযোগ্যা। মেয়েরা কলেজে পড়ে। ছেলেরা স্কুলে। খগেনের একশ' টাকাতে কুলোয় না। সকাল-বিকেল টিউশনিও করতে হয়।

হঠাৎ সদাশিবের মনে হ'ল খগেন যদি সিতাবী হ'ত তাহলে কি ঠিক হ'ত? কথাটা মনে হতেই শিউরে উঠলেন তিনি। সিতাবী অশিক্ষিত মাতাল, তার বউও তাই। দুজনেই সিফিলিস-গ্রস্ত। ওর ছেলেমেয়েগুলোও কেউ সুস্থ নয়। মাঝে মাঝে ডগমগে রঙিন কাপড় পরে বটে, কিন্তু খুব নোংরা। সিতাবীর জোয়ান মেয়ে দুটোও পাজি, নানারকম বদনাম ওদের সম্বন্ধে। আর খগেন সরখেল শিক্ষিত ভদ্রলোক। সাহিত্য-প্রীতি আছে, সংগীতানুরাগ আছে। ভালো বেহালা বাজাতে পারেন, যথাসাধ্য সামাজিক শালীনতা বজায় রেখে চলবার চেষ্টা করেন—উনি সিতাবীর স্তরে নেবে যাবেন একথা ভাবাও যায় না। খগেন সরখেলদের জীবনের ট্র্যাজেডি এঁরা আশানুরূপ উপার্জন করতে পারেন না। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান কি?

স্বাধীনতা হওয়ার পর থেকে এদের সমস্যা তো উত্তরোত্তর জটিলতর হচ্ছে। দম-বন্ধ হ'য়ে আসছে এদের, চারদিকে নানা বিধি-নিষেধের প্রাচীর তুলে এদের নিশ্চিহ্ন করবার চেষ্টা করছেন সরকার। এদের বাঁচবার উপায় কি? বিদ্রোহ? এরা কি বিদ্রোহ করতে পারবে? গান্ধিজীর একটা উক্তি তাঁর মন পড়ল—'In Satyagraha, it is never the number that counts···Indeed one perfect

civil resister is enough to win the battle of Right against Wrong'—অন্যায়ের বিরুদ্ধে একজনও বিশুদ্ধ-চরিত্র যোদ্ধা যদি মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাহলেই যুদ্ধ জয় হবে। এ যুদ্ধে সৈনিকের সংখ্যা বেশী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কোথায় সেই একজন বিশুদ্ধ-চরিত্র 'perfect' সৈনিক? এদের মধ্যে আছে কি একজনও? একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলেন সদাশিব। ছিপলি যে তাঁর আশে-পাশে ঘুরঘুর করছে তা দেখতে পান নি। হঠাৎ দেখতে পেলেন।

"কি ছিপলি? তোর পেটের ব্যথা কেমন আছে?"

"ভাল হ'য়ে গেছে। আপনি ওঁকে একবার দেখুন। দিন দিন কমজোর হ'য়ে যাচ্ছে—"

ছিপলির স্বামী কাচুমাচু মুখে পাশেই দাঁড়িয়েছিল। ছোঁড়া একটা। ছিপলির চেয়ে বয়স কম ব'লে মনে হয়। পাণ্ডুর রক্তহীন চেহারা। সদাশিব ওই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েই তার চোখ দেখলেন, জিব দেখলেন। তাঁর সন্দেহ হ'ল পেটে 'হুক্ওয়ার্ম' আছে। বললেন, "মোটরের কাছে গিয়ে দাঁড়া, ওষুধ দিচ্ছি।" চ'লে গেল তারা।

তারপর তিনি তাঁর অন্যান্য রোগীদেরও খোঁজ নিলেন। আবদুলের ছেলের আর জ্বর হয় নি। কয়লার চোখ-ওঠা অনেকটা কমেছে। ভগলুর নাতির খোসও প্রায় ভাল হ'য়ে গেছে। সুখনের ছেলের টাইফয়েড হয়েছে। তার জ্বরটা ছাড়ে নি এখনও। দামী বিলিতী ওষুধ দিয়েছেন তাকে সদাশিব, তবু ছাড়ে নি।

হঠাৎ কেব্‌লির সঙ্গে দেখা হ'ল। দন্ত বিকশিত ক'রে একটু হেসে আধঘোমটা দিয়ে স'রে দাঁড়াল সে। তার স্বামী নারান কয়েক-দিন আগে ছাড়া পেয়েছে। কেব্‌লি তার জন্যেই পাঁটার 'কলিজা' (মেটে) কিনতে এসেছিল। কয়েকদিন জেলে থেকে না কি কমজোর হ'য়ে গেছে নারান।

বাইরে এসে সদাশিব দেখলেন মোটরের কাছেও বেশ ভিড়। আর একদল ঝাঁকামুটে ছোঁড়া দাঁড়িয়েছিল ফরসা কাপড় প'রে। যথারীতি সদাশিব সকলের চোখ দেখলেন, দাঁত দেখলেন, চারটে ক'রে পয়সা দিলেন। পাশেই যে দোকানটা ছিল তাকে বললেন—এদের প্রত্যেককে একটা ক'রে লজেন্‌স্‌ দিতে। বারোজন ছিল, বারোটা লজেন্‌সের দাম দিয়ে দিলেন। ওদের মধ্যে একটা ছেলে বলল, "ডাক্তারবাবু, যোগীয়া আপনাকে ঠকিয়েছে। ও নিজে কাপড় পরিষ্কার করে নি, আর একজনের পরিষ্কার কাপড় প'রে এসেছে।" সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়া বেধে গেল। ঝগড়া মেটাতে দেরি হ'য়ে গেল সদাশিবের। যোগী সত্যিই প্রতারণা করেছিল। ধরা পড়ে গিয়ে কাঁদতে লাগল খুব। শেষকালে তাকে আর একটা লজেন্‌স্‌ দিয়ে থামাতে হ'ল। তারপর ছিপলির স্বামীকে ওষুধ দিলেন তিনি। আরও কয়েকজনকে দিলেন। গাড়িতে উঠতে যাবেন এমন সময়ে বাঁড়ুয্যে মশায়ের গলা শুনে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল তাঁকে।

"ডাক্তারবাবু, আপনার জন্যেও কিছু কুঁচো চিংড়ি বাছলুম। বাড়িতে বেগুন আছে তো? না থাকে তো আধসেরটাক কিনে নিয়ে যান। বেগুন-চিংড়ি ক'রে দিতে বলবেন আপনার রাঁধুনীকে। মসলা কিছুই নয়। পেঁয়াজের ফোড়ন দিতে হবে বেশী ক'রে। আর মাছগুলো যেন বেশ লাল লাল ক'রে ভেজে নেয়। বেগুনও পেঁয়াজের সঙ্গে বেশ ক'রে ভাজতে হবে। রুটি বা লুচি দিয়ে খেলে সুখ পাবেন—"

"আপনার মাছগুলোই আমাকে দিয়ে দিলেন না কি—"

"না, অতটা নিঃস্বার্থপর আমি নই। নিজেরটা রেখে তবে আপনাকে দিয়েছি—"

বাঁড়ুয্যে মশাই বেঁটে লোক। সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে থাকেন।

মুখে ভাবের অভিব্যক্তি বড় একটা হয় না। কিন্তু সদাশিব লক্ষ্য করলেন তাঁর মুখে একটা মৃদু হাসির আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

"অনেক ধন্যবাদ। আপনার নাতনীর হাতের রান্না খেতে একদিন যাব কিন্তু—"

"নিশ্চয় নিশ্চয়। যেদিন খুশী। কমল সেদিন বলছিল আপনি খুব খাইয়েছেন তাকে। আমার তো হজমশক্তি নেই, থাকলে আমিও একদিন আপনার সঙ্গে খেয়ে আসতুম—"

"আসুন না একদিন। আপনার হজমশক্তির মতোই ব্যবস্থা করা যাবে—"

বাঁড়ুয্যে মশাই নমস্কার করলেন।

"না, ও কথা ঠাট্টা করে বললাম। আমি কোথাও নিমন্ত্রণ খাই না। গুরুদেবের বারণ—"

কমলের কথায় সদাশিবের মনে পড়ল মিস্টার পরসাদের কথা। কমলের কথা তো তাঁকে বলা হয় নি। কমল হয়তো আশা ক'রে আছে। তখুনি মিস্টার পরসাদের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন তিনি।

নয়

সদাশিব ডায়েরি লিখছিলেন।

"মালতীকে নিয়ে বেশ একটু চিন্তায় পড়েছি। আজকাল তার বড় ঘন ঘন 'ফিট্' হচ্ছে। 'ফিট'-এর ব্যাপারটা গা-সওয়া হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাল রাত্রে হঠাৎ যা কানে এল তাতে একটু বিব্রত বোধ করছি। কাল রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার ঘুম আসছিল না। বারান্দায় গিয়ে ইজিচেয়ারে ব'সে ছিলাম। বারান্দার ঠিক

পাশেই মালতীর শোবার ঘর। মালতীর সঙ্গে চিরঞ্জীবের কথোপকথন আমার কানে গেল। স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। এ সম্ভাবনাটা আমার মনে একদিনও উদয় হয় নি।

মালতী বলছিল, 'আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে। বেঁচে আমার সুখ কি! তোমার কাকার সংসারে রাঁধুনীবৃত্তি করতে করতে তো হাড় কালি হ'য়ে গেল। বিয়ে হ'য়ে ইস্তক তো ওই কাজই করছি। উনি বাহাদুরি করে' রাজ্যের লোককে নিমন্ত্রণ করবেন আর আমাকে তাদের জন্যে কাঁড়ি কাঁড়ি রাঁধতে হবে। সকাল থেকে রাত্তির এগারোটা পর্যন্ত ওই আজবলালের টিকি ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকা অসহ্য হয়েছে আমার পক্ষে। আমি আর পারছি না, পারছি না—'

মালতী কান্নায় ভেঙে পড়ল। চিরঞ্জীব নিম্নকণ্ঠে কি বললে ঠিক শুনতে পেলাম না। সম্ভবতঃ সান্ত্বনা দিতে লাগল।

মালতীর যেটা দুঃখের কারণ—বন্ধ্যাত্ব—তা কেউ ঘোচাতে পারবে না। ওরই দু'চারটে ছেলে-মেয়ে হ'লে ওর অন্যরকম চেহারা হ'ত। কিন্তু আমি ওর দুঃখের নিমিত্ত হ'য়ে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়েছি। মনে হচ্ছে ওকে আমার গৃহস্থালীতে কর্ত্রীপদে বরণ ক'রে হয়তো ভুল করেছি।

চিরঞ্জীব এক অজ পাড়াগাঁয়ে একশ' টাকা বেতনে স্কুলমাস্টারি করত। খুব কষ্টে ছিল। প্রায়ই ম্যালেরিয়ায় ভুগত। তাই আমি ওকে নিয়ে এসেছিলাম। যে একশ' টাকা ওখানে মাইনে পেত সে একশ' টাকা আমি ওকে মাসে মাসে হাত-খরচস্বরূপ দিই। ওরা এখানে যে স্টাইলে থাকে সে স্টাইলে ওরা মাসে পাঁচশ' টাকা রোজগার করলেও থাকতে পারত না। মালতীর শাড়ি গয়নার অভাব রাখি নি। ওর যে কোনও শখ বলবামাত্রই মিটিয়ে দিয়েছি। বাড়িতে খরগোশ, কাবুলী বিড়াল, কুকুর, পায়রা, নানারকম পাখী—সব

ওর জন্যই। তবু দেখছি ও সুখী নয়। আমার সংসারকে ও নিজের সংসার ক'রে নিতে পারে নি। ওর সর্বদাই মনে হচ্ছে—এটা কাকার সংসার। কিন্তু আমার সংসারে ওরাই তো সর্বেসর্বা।

সোহাগ তার স্বামীর সঙ্গে বিলেত চ'লে গেছে। কন্টিনেণ্ট টুর করছে। সোহাগের স্বামী বিলেতেই একটা ভালো চাকরি পেয়েছে। বাড়িও কিনেছে লণ্ডনের কাছাকাছি একটা জায়গায়। হয়তো ওইখানেই শেষ পর্যন্ত বসবাস করবে। অর্থাৎ ওদের সঙ্গেও আমার সম্বন্ধ ছিন্ন হ'ল যদি না আমিও ওদের সঙ্গে গিয়ে বাস করি। সোহাগ লিখেওছে যেতে। অনেক শিক্ষিত লোক নাকি এদেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে বিলেত বা আমেরিকায় গিয়ে বাস করছে। সেখানে না কি সব রকম সুবিধা। হোক সুবিধা, আমি বিদেশে যেতে পারব না। লক্ষ্য করছি সব সময় সব ব্যাপার নিজের সুবিধার মানদণ্ডে মাপতে গিয়ে অনেক লোক পশুর স্তরে নেমে যাচ্ছে। স্বদেশের ঠাকুরকে অবহেলা করে' বিদেশের কুকুরকে আদর করার জন্য কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাদের গাল দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁর গালাগাল গায়ে মাখি নি। সাহেবরা এদেশ থেকে চ'লে যাওয়ার পর থেকে আমাদের বিদেশী-প্রীতি যেন হু হু ক'রে বেড়ে যাচ্ছে। এটা দুর্লক্ষণ। সাহেবদের অনেক সদ্‌গুণ আছে স্বীকার করি, সেই সদ্‌গুণগুলি আমরা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারি, কারণ সদ্‌গুণ কোনও বিশেষ দেশের বিশেষ মানুষদের সম্পত্তি নয়। সেগুলি আয়ত্ত করবার জন্যে প্যাণ্ট নেকটাই পরবার বা গরু খাবার দরকার নেই, তার জন্যে দেশ ছেড়ে বিদেশ যাওয়াও অনাবশ্যক।

এক বিলেত-ফেরত ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন—বিলেতে সাহেবরা সামনাসামনি আমাদের সঙ্গে যত ভদ্রতাই করুক, আড়ালে আমরা তাদের চোখে 'ব্রাউনি', একটা অদৃশ্য সীমারেখা টেনে মনে মনে

ওরা আমাদের সর্বদাই তফাত ক'রে রাখে। নিজেদের মধ্যে হয়তো আমাদের নিয়ে হাসাহাসিও করে। রবীন্দ্রনাথের মতো লোকের সম্বন্ধেও একজন বিখ্যাত লেখকের যে সব প্রাইভেট চিঠিপত্র বেরিয়েছিল তা পড়বার পর আর ওদেশে যেতে ইচ্ছা করে না। রবীন্দ্রনাথকে তো আমেরিকার লোকেরাও ভারতীয় ব'লে অপমান করেছিল। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে চ'লে আসেন। আমার মেয়ে জামাই সেই বিদেশে গিয়ে থাকবে ঠিক করেছে। করুক, আমি যাব না। এই দেশে জন্মেছি, এই দেশেই মরব।

সদাশিব একটা বড় দীঘির ধারে চেয়ার টেবিল পেতে লিখছিলেন। দীঘির ধারে 'কুঁজড়া' (যারা তরকারি ফলিয়ে বিক্রি করে) জগদীশের ঘর। জগদীশ নবীগঞ্জের হাটে তরকারি বেচে। বুড়ো মানুষ। তার স্ট্র্যাংগুলেটেড্ হার্নিয়া হ'য়ে মরমর হয়েছিল। খবর পেয়ে সদাশিব এসে সেটা অপারেশন করেছেন। দুঃসাধ্য কাজ। উলফৎ কম্পাউণ্ডার এবং ড্রাইভার আলীর সহায়তায় এটি করেছেন তিনি। সকাল থেকে এইখানেই ব'সে আছেন। কম্পাউণ্ডার উলফৎকে বসিয়ে রেখেছেন জগদীশের কাছে। জগদীশের জ্ঞান হয়েছে। তবু বসিয়ে রেখেছেন উলফৎকে। আরও ঘণ্টাখানেক পরে ছুটি দেবেন। উলফৎ বুড়ো অভিজ্ঞ কম্পাউণ্ডার। সদাশিব যখন চাকরি করতেন তখন হাসপাতালে ছিল। এখন সে-ও রিটায়ার করেছে। সদাশিব বাইরে যখন অপারেশন করেন উলফৎকে ডাকেন।

জগদীশের মেয়ে এসে বললে—"বাবুজি ভাল আছে। হাসছে—"

"আমার জন্যে একগ্লাস শরবত ক'রে নিয়ে আয়। আমার গাড়ি থেকে গ্লাস নিয়ে যা—"

মেয়েটা দৌড়ে চ'লে গেল।

দশ

ভোর পাঁচটা। সদাশিব বাইরের 'লনে' চুপ ক'রে ব'সে আছেন একা একটা ক্যাম্প চেয়ারে। ছুটো কোকিল ডাকাডাকি করছে। তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ডাকছে আরও কয়েকটা পাখী। ছুটো হাঁড়িচাঁচা মিষ্টিসুরে কথাবার্তা কইছে পরস্পরের সঙ্গে। মনে হচ্ছে যেন বলছে 'খুকু নেই' 'খুকু নেই'। টংক্ টংক্ টংক্ একঘেয়ে সুরে ডেকে চলেছে স্যাকরা পাখী। কয়েকটা ছুর্গাটুনটুনি উড়ে বেড়াচ্ছে কলকে ফুলের ঝাড়ে। কলকে ফুলের ভিতর লম্বা ঠোঁট চালিয়ে মধু খাচ্ছে আর কিচ্‌কিচ্ কিচ্‌কিচ্ চর্‌বর্ ক'রে শব্দ করছে। সদাশিবের স্প্যানিয়েল কুকুর 'লোমেশ' সামনে ব'সে আছে থাবার উপর মুখ রেখে। উৎসুকদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সদাশিবের মুখের দিকে। সদাশিব যে আজ বিশেষ রকম অন্যমনস্ক তা যেন সে বুঝতে পেরেছে। বাড়ির চাকরটা একটা চৌকো টুল রেখে গেল সামনে। তারপর একটা ট্রের উপরে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এসে রাখল তার উপর।

"চা কি ছেঁকে দেব—"

"থাক্। আর একটু ভিজুক—"

সদাশিব অন্যমনস্কভাবে পাখীদের গান শুনতে লাগলেন পা দোলাতে দোলাতে। চায়ের দিকে তেমন মনোযোগ দিলেন না। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল লোমেশ উৎসুকদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাঁর দিকে আর আস্তে আস্তে ল্যাজ নাড়ছে। তিনি ট্রের উপর থেকে একটা বিস্কুট ছুঁড়ে দিলেন তার দিকে। লোমেশ সেটাকে আর মাটিতে পড়বার অবসর দিলে না, শূন্য থেকেই লুফে নিলে সেটাকে মুখ দিয়ে। একটা বিস্কুট খেয়ে সে উৎসাহভরে উঠে পড়ল এবং একটু এগিয়ে এসে

ঘন ঘন ল্যাজ নাড়তে লাগল। আর একটা বিস্কুট দিলেন তাকে, তারপর আর একটা।

"আরও বিস্কুট কি এনে দেব—"

সদাশিব ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন আজবলাল দাঁড়িয়ে আছে। সে যে কখন এসেছে তা টের পান নি তিনি। সদাশিব দেখলেন তার চোখে মুখে একটা কুণ্ঠিত স্মিত হাসি ফুটে উঠেছে—সদাশিব যেন ক্রীড়ারত শিশু একটা—ক্রীড়াচ্ছলে দামী বিস্কুটগুলো কুকুরকে খাওয়াচ্ছেন। তাঁর উদারতায় সে মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু অপচয়শীলতায় ক্ষুব্ধও কম হয় নি। তার মনে হচ্ছে মালতী থাকলে তাঁকে হয়তো শাসন করত, কিন্তু সে তো তাঁকে শাসন করতে পারে না। মনিব যে!

"না, আমার আর বিস্কুট চাই না।"

"চা-টা কি ছেঁকে দেব? ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে।"

"দাও—"

আজবলাল চা ছাঁকতে লাগল।

মালতীকে নিয়ে চিরঞ্জীব কাল চ'লে গেছে কাশ্মীর। সদাশিবই জোর ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাদের।

তাঁর মনে হয়েছে বাইরে একটু বেড়িয়ে এলে হয়তো মালতীর মনটা ভাল হবে।

প্রস্তাবটা শুনে চিরঞ্জীব আশ্চর্য হয়েছিল প্রথমটা।

"কাশ্মীর? সেখানে গিয়ে কি হবে!"

"ওর মনটা ভাল হবে। একঘেয়ে জীবন থেকে একটু ছাড়া পেয়ে বাঁচবে। ওকে কিছুদিন নানা জায়গায় নিয়ে ঘুরে বেড়াও। দিল্লী, আগ্রা, কাশী, হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন যেখানে ও যেতে চায় নিয়ে যাও ওকে। এতে একটু উপকার হবে মনে হয়। টাকার জন্যে ভেবো না, সে আমি ব্যবস্থা করব—"

বলল না। কিন্তু সে মনে মনে বুঝল সদাশিব মালতীর পরিবর্তিত মনোভাবের আভাস পেয়েছেন। এজন্য নিজেই সে মনে মনে কুণ্ঠিত হ'য়ে ছিল। কিন্তু কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে সে-ও যেন বাঁচল। এতে মালতীর উপকার হবে কি না তা সে জানত না, কিন্তু মালতীকে যে কাকার কাছ থেকে সে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারছে এতেই সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। তার ভয় ছিল মালতী কোনদিন প্রকাশ্যে কোনও কেলেঙ্কারি ক'রে না বসে।

মালতী কাল চ'লে গেছে। যদিও বাড়িতে চাকরবাকরের অভাব নেই, তবু যেন বাড়িটা খালি খালি মনে হচ্ছে সদাশিবের। মালতী যেন বাড়িটার অনেকখানি পূর্ণ করে' থাকত। তার চীৎকার চেঁচামেচি, চাকর ঠাকুরের উপর তার দোর্দণ্ড প্রতাপ বাড়ির সমস্ত আবহাওয়াকে সরগরম ক'রে রাখত। হঠাৎ সব যেন নিঝ্‌ঝুম হ'য়ে গেছে।

সদাশিব চা খেয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন আরও খানিকক্ষণ। খবরের কাগজওলা এসে কাগজ দিয়ে গেল। সদাশিব খবরের কাগজ কেনেন কিন্তু পড়েন না। চিরঞ্জীবই কাগজ প'ড়ে দরকারী খবর মাঝে মাঝে শোনাত তাঁকে। কাগজটা দেখে আর একবার চিরঞ্জীবের কথা মনে পড়ল।

একটু পরেই গেটের কাছে মোটর এসে দাঁড়াল একটা। কমল নেমে এল মোটর থেকে।

"কি খবর কমল, এত সকালে হঠাৎ ?"

"কাল জগদীশপুর হাটে গিয়েছিলাম। এস. ডি. ও. সাহেবের গাড়ি খারাপ হয়েছিল সেখানে। হাটে দেখলাম, বেশ সস্তায় মুরগি বিক্রি হচ্ছে। কিনে নিয়ে এসেছি গোটা ছয়েক। মালতীদি-কে

বলুন ভাল ক'রে রান্না করতে। রাত্রে এসে খাব। আমার জন্যে যেন রুটি করেন।"

"মালতী কাশ্মীর বেড়াতে গেছে। যাক্ তার জন্যে আটকাবে না,—এই আলী—"

"হুজৌর—"

আলী সেলাম ক'রে এসে দাঁড়াল।

"বাবুর্চি গোলাম রসুলকে খবর দাও, আজ এখানে এসে রাঁধবে।"

"বহুত খু—"

"আমি তো এখুনি বেরুব। তখনই যাবার পথে বলে' যাব তাকে—"

"বহুত খু—"

"মুরগিগুলো নাবিয়ে রেখে দাও—"

"বহুত খু—"

আলী চলে' গেল। সদাশিব কমলকে জিগ্যেস করলেন, "তোমার বিল আদায় হ'ল ?"

"হয়েছে। মিস্টার পরসাদ এমন জোর কলমে লিখলেন যে বাপ বাপ করে' টাকা দিয়ে দিলেন। তাই না মবলগ দশ টাকা খরচ করে' মুরগি কিনলাম কাল !"

সদাশিব হাসলেন। একবার ইচ্ছে হ'ল তাকে মিতব্যয়ী হ'তে উপদেশ দেন। কিন্তু নিজের কথা ভেবে তা আর দিলেন না।

"আচ্ছা চলি এখন। একটা মোটর 'চুর' হ'য়ে এসেছে কারখানায়।

অ্যাক্সিডেণ্ট করে' এসেছে। গাড়ির ভিতর রক্তও রয়েছে। ওরা বলছে রক্ত মানুষের নয়, ওরা কোথায় যেন পুজো দিয়ে পাঁঠা বলি দিয়েছিল, সেই কাটা পাঁঠাটা গাড়িতে ছিল, তারই রক্ত—"

"চেনা গাড়ি ?"

"না, বাইরের গাড়ি। মোটরের নম্বর রাঁচির। কি করব বলুন তো ?"

"পুলিসে খবর দাও। পুলিস এসে দেখে যাক, তারপর গাড়িতে হাত দিও। তা না হ'লে ফ্যাসাদে পড়ে' যেতে পার।"

"তাই করি তাহলে।"

কমল চলে' গেল।

তারপর সদাশিবের মনে পড়ল বন্থুর ওখানে যেতে হবে। বন্থু কয়লা-গুদামের কুলি। কাল থেকে তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। বন্থু কয়লা-গুদামেরই একধারে থাকে। তার দেশ কোথায় কেউ জানে না, তাকে সবাই চিরকাল কয়লা বইতেই দেখেছে। ঘাড়ে-গর্দানে চেহারা, কুচকুচে কালো। ঘাড়টা একধারে একটু বেঁকা। গলার স্বর ঝাপসা। কাল যখন সদাশিব বাজারে গিয়েছিলেন তখন তাঁর সামনেই বন্থু কয়লার বোঝা সুদ্ধ রাস্তায় পড়ে' যায়। তারপর তার মুখ থেকে রক্ত উঠতে থাকে। সদাশিব তাকে গাড়ি ক'রে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু বন্থু যেতে চাইলো না। বললে, ওখানে গেলেই পয়সা চাইবে। আমার পয়সা নেই। আমাকে ওই গুদামেই নিয়ে চলুন। গুদামের মালিক সৌখা মাড়োয়ারি একটা ঘর খালি করিয়ে দিয়েছেন। ঠিক পাশেই যে কয়লার গুদামটা আছে সেখানে একটা ভালো ঘর ছিল; কিন্তু সে গুদামের মালিক বাঙালী সর্বেশ্বরবাবু। তিনি সর্ববিষয়ে গা বাঁচিয়ে হিসাব ক'রে চলেন, তাই সে ঘরে ও টি· বি· রোগীকে ঢুকতে দেন নি। বন্থুর টি· বি· হয়েছে কি না তা সদাশিব এখনও ঠিক করতে পারেন নি, কিন্তু সর্বেশ্বর এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

সদাশিব উঠতে যাবেন এমন সময়ে আধঘোমটা দিয়ে কেব্‌লি এসে দাঁড়াল।

"কি খবর কেব্‌লি ?"

কেব্‌লি ফুপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

"কি ব্যাপার, কি হয়েছে—"

কেব্‌লি কাঁদতেই লাগল। তারপর অশ্রুজড়িত কণ্ঠে থেমে থেমে বলল যে নারান তাকে কাল মেরেছে। তার মাথা কেটে গেছে।

"সে কি!"

"দেখো নি" (দেখ না)

মাথার কাপড় তুলে সে দেখাল। সামনের চুলগুলো শুকনো রক্তের চাপে জড়িয়ে গেছে। সদাশিব তার চেহারা দেখে ভয় পেলেন। চোখে অশ্রু লেগে আছে বটে কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ, যেন সর্পিণী ফণা তুলেছে। কিছুদিন আগে এই রকম এক স্বামী-লাঞ্ছিতা কাহারনী তার স্বামীকে দা দিয়ে কেটে ফেলেছিল। ঘটনাটা হঠাৎ মনে পড়ল।

"কেন মারলে কেন তোকে—"

তখন কেব্‌লি আসল কারণটি বিবৃত করল। নারান আবার একটি বিয়ে করতে চায়। কেব্‌লি বাঁজা। সুতরাং নারানের দ্বিতীয়বার বিয়ে দিতে চাইছে তার ভাই। তার মায়ের—মানে কেব্‌লির শাশুড়ীর এতে মত নেই।

"নারানের মা বেঁচে আছে নাকি এখনও?"

"হ্যাঁ। দেহাতে সে জমিতে কাজ করে—"

"কোথায় নারানের বিয়ে ঠিক হয়েছে?"

"ওই দেহাতেই। একটা কানী বিধবা ওকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। কে ভাল মেয়ে দেবে ওই বুড়োকে—"

"এ মেয়েটার বয়স কত—"

"তা জোয়ান আছে—"

"তোকে মারতে গেল কেন শুধু শুধু—"

"বাঃ, আমার মত না পেলে তো বিয়েই হবে না। আমাদের সমাজের নিয়ম যে, 'পনূচ্'-এর (সমাজের মোড়লদের) সামনে আমি যতক্ষণ না বলব যে আমার এ বিয়েতে মত আছে, ততক্ষণ ওকে কেউ মেয়ে দিতে পারবে না। আমার সেই মত নেবার জন্যে আমাকে ও মারধোর শুরু করেছে—"

কেব্‌লিরা জাতে মুচি। তাদের সমাজে এরকম নিয়ম আছে শুনে সদাশিব বিস্মিত হলেন।

"এ ব্যাপারে আমি কি করব বল—"

"আপনি দারোগা সাহেবকে ব'লে আবার ওকে জেলে পুরে দিন। ওরকম মারখুণ্ডা শন্‌কাহা মানুষের জেলে থাকাই উচিত—"

সদাশিব হেসে ফেললেন।

"সে কি হয়। আচ্ছা, তুই বাড়ি যা। নারানের সঙ্গে দেখা হ'লে তাকে বলব আমি—"

কেব্‌লি চ'লে গেল।

সদাশিবের গাড়ি যখন কয়লা-গুদামের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তখন সেখানে কেউ ছিল না। গুদামের মালিকরা কেউ আসেন নি তখনও, কুলিরাও কেউ আসে নি। বন্ধুকে কাল যে ঘরটায় সদাশিব রেখে গিয়েছিলেন সে ঘরের কপাট দুটো খোলা। সদাশিব মোটর থেকে নেবে দাঁড়িয়ে পড়লেন ক্ষণকালের জন্য। কয়লার স্তূপগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন। মনে হ'ল যেন শ্মশানে দাঁড়িয়ে আছেন। 'কয়লা-গুলো তো মৃত অরণ্যের কঙ্কাল, মাটির তলা থেকে খুঁড়ে আবার সেগুলো পোড়াচ্ছি আমরা'—এই দার্শনিক চিন্তা ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক ক'রে দিল তাঁকে। তারপর তিনি এগিয়ে গেলেন বন্ধুর

ঘরটার দিকে। গিয়ে দেখলেন বন্নু মুখ গুঁজড়ে উপুড় হ'য়ে শুয়ে আছে, আর ঘরের কোণে বসে' আছে একটা লোম-ওঠা রাস্তার কুকুর। বন্নু যখন দুপুরে ছাতু খেত এই কুকুরটাকে ছাতুর গুলি পাকিয়ে পাকিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিত। সেই কুকুরটা ব'সে আছে চুপ ক'রে। আর একফালি রোদ বন্নুর মাথায় পিঠে সোনালী চাদরের মতো বিছানো রয়েছে। সদাশিব পরীক্ষা ক'রে দেখলেন বন্নু মারা গেছে। নিস্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

অনেকদিন আগেকার ছবি ফুঠে উঠল তাঁর মনে। সেদিন রবিবার। সব কয়লার দোকান বন্ধ। তার উপর বৃষ্টি পড়ছে। সেদিন বাড়িতে তিনি কয়েকজনকে খেতে বলেছেন। মালতী খেয়াল করে নি যে আগের দিন রাত্রেই কয়লা ফুরিয়ে গেছে। সকালবেলা চাকর বাজার থেকে ফিরে এসে বলল, সব দোকান বন্ধ, কয়লা পাওয়া যাচ্ছে না। সঙীন পরিস্থিতি। সদাশিব নিজে বেরুলেন শেষকালে। বৃষ্টি পড়ছিল খুব। রাস্তাঘাট সব ফাঁকা। মাছের দোকানের গলিটার সামনে এসে দেখলেন বন্নু রাস্তার ধারে মাথায় বোরা-ঢাকা দিয়ে বসে' আছে। নেবে পড়লেন তিনি গাড়ি থেকে। তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়াল বন্নু। মুখে স্নিগ্ধ হাসি। বাঁকা ঘাড়টা আর একটু বেঁকিয়ে সেলাম করলে তাঁকে।

"বন্নু, মহামুশকিলে পড়েছি…"

সকল কথা বললেন বন্নুকে।

বন্নু ঝাপ্‌সা গলায় ভরসা দিল।

"আপনি বাড়ি যান, এখনি কয়লা পৌঁছে দিচ্ছি আমি—"

"সব দোকান তো বন্ধ, কোথায় পাবে তুমি—"

কোথায় পাব তা সে বলে নি। কেবল বলেছিল, 'পাব'।

"দামটা নাও তাহলে—"

একটা পাঁচটাকার নোট বার ক'রে দিয়েছিলেন সদাশিব।

"ভাঙানি তো নেই। দাম আমি পরে নিয়ে নেব—"

এক ঘণ্টা পরেই বন্থু ভিজতে ভিজতে কয়লা দিয়ে গিয়েছিল। এতদিন পরে সদাশিব মনে করতে পারলেন না, বন্থু কয়লার দামটা চেয়ে নিয়েছিল কি না। কারণ তারপর বন্থুর সঙ্গে আর তাঁর দেখাই হয় নি অনেকদিন। মালতী হয়তো দিয়ে থাকবে—এই ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করলেন তিনি। অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন সদাশিব। ভাবতে লাগলেন এই আত্মীয়স্বজনহীন লোকটার এখন আর কি করতে পারেন তিনি। এখন তো ও চিকিৎসার বাইরে চ'লে গেছে। সেদিনের সেই কথাটা স্মরণ ক'রে তিনি অনুভব করলেন আজও তিনি বন্থুর কাছে ঋণী আছেন। কি ক'রে এ ঋণ শোধ করা যায়? কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন আরও, তার পর বুঝতে পারলেন এ ঋণ শোধ করা যাবে না। সব ঋণ শোধ করা যায় না।

"রাম রাম ডাক্‌টার সাহেব। বন্থু কেমন আসে?"

সদাশিব ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, সৌখী মাড়োয়ারি এসে তাঁর আপিসের চাবি খুলছেন।

"বন্থু মারা গেছে—"

"মরিয়ে গেলো? সরবোনাস্ হ'ল তাহলে। ও মুরদাকে এখন ফেক্‌বে কে?—"

বিদ্যুৎ-চমকের মতো একটা কথা মনে হ'ল সদাশিবের। বললেন, "সে ব্যবস্থা আমি করছি—"

"আপনে কোরবেন? কম সে কম দশ পন্‌দরহ্ টাকা খরচা হইয়ে যাবে—"

"দেখি—"

তখনি মোটরে ক'রে বেরিয়ে গেলেন সদাশিব। বন্থুকে বাজারে

সবাই চিনত। লোক সংগ্রহ করতে বিলম্ব হ'ল না। সদাশিব খাটিয়া শালু আর ফুল কিনে দিলেন। বাজারে যত ফুল পাওয়া গেল সব কিনলেন। সিপ্‌লি, আবতুল আর ঝকমুও যোগাড় ক'রে নিয়ে এল কিছু ফুল। একদল কীর্তনিয়াও জুটে গেল। বেশ বড় শোভাযাত্রা ক'রে মহা-সমারোহে বনু চ'লে গেল মহাপ্রস্থানের পথে। সদাশিব লক্ষ্য করলেন শোভাযাত্রার পিছন পিছন সেই লোম-ওঠা কুকুরটাও চলেছে। সদাশিবের সবসুদ্ধ খরচ হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ টাকা। এত কম টাকার বিনিময়ে এমন প্রচুর আনন্দ তিনি জীবনে আর কখনও পান নি। অনেকদিন পরে তাঁর মন অনাবিল তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল। একটু দূরে দূরে তিনিও শবানুগমন করতে লাগলেন তাঁর মোটরে।

"রাম রাম ডাক্‌টার সাহেব—"

সৌখী মাড়োয়ারিকে দেখে গাড়ি থামালেন সদাশিব। "হামার বড় তাজ্জুব লাগছে। আপনে এক কুলিকে লিয়ে কাহে এত্‌না রুপিয়া খরচ কর ডালা হমরা সমঝ্‌ মে নেহি আতা হ্যয়—"

সদাশিব দেখলেন এর আধ্যাত্মিক দিকটা সৌখী মাড়োয়ারিকে বোঝাতে অনেক সময় লাগবে। তাই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বললেন— "বনুর কিছু টাকা আমার কাছে জমা ছিল। সে টাকাই লাগিয়ে দিলাম এতে।"

"ও, আব্‌ সমঝা। ভালো করিয়েসেন—রাম রাম।"

সৌখী মাড়োয়ারি চ'লে গেলেন।

আলী আবার স্টার্ট দিলে মোটরে।

"আস্তে আস্তে চল—"

কিছুদূর যাবার পর একটা খুব রঙ্‌চঙে রিক্‌শা সামনে এসে দাঁড়াল। রিক্‌শার পিছনে একটি উন্মুক্ত-বক্ষা অত্যাধুনিকা অভিনেত্রীর ছবি রয়েছে। রিক্‌শার গদি লাল সাটিনের, হুডটা সবুজ রঙের।

হুডের চারিধারে চমৎকার ঝালর দেওয়া। সাইকেলের হাতলে একরাশ সোঁদাল ফুল। রিক্‌শাচালক নেমে খুব ঝুঁকে সেলাম করলে সদাশিবকে। শুকুরের ছেলে সিদ্দিক। একেই তিনি কিছুদিন আগে হাটে চড় মেরেছিলেন। গণোরিয়া হয়েছিল ছোকরার।

"কৈসা হ্যয়—"

"ছুট্ গিয়া হুজুর। আওর কি সুই লেনা পড়ে গা ?"

"কল্ পেসাব লে কর আও, দেখেঙ্গে—"

শোভাযাত্রার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে সিদ্দিক আলীকে জিগ্যেস করলে, "ইয়ে জুলুস কিস্ কা হ্যায়—"

আলী তখন তাকে বললে যে বনু ম'রে গেছে, তাকেই শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে সবাই।

"ময় ভি যাউঙ্গা—"

সিদ্দিক তার রঙীন রিক্স্শা চালিয়ে চ'লে গেল ভিড়ের মধ্যে সাইকেলের ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে।

শ্মশান থেকে সদাশিব গিয়েছিলেন তিরমোহানীর হাটে। সেখানে অনেকগুলি রোগীর আসার কথা ছিল। সেখানে দেখা হ'ল গীতার সঙ্গে। গীতা সেখানে মহুয়া দই বিক্রি করছিল। সে উদ্ভাসিত মুখে সদাশিবের দিকে চেয়ে মাথার কাপড়টা টেনে দিল একটু। তারপর তার পাশেই যে বলিষ্ঠ গুঁপো লোকটি ব'সে ছিল তাকে ফিসফিস ক'রে কি বললে। নমস্কার ক'রে উঠে দাঁড়াল লোকটি।

"কে তুমি, চিনতে পারছি না তো—"

"শকলদীপ—"

পাশের একজন পরিচয় করিয়ে দিলে শকলদীপ গীতার স্বামী।

শকলদীপ আহীর গোয়ালাদের মিষ্টি ভাষায় মৃদুকণ্ঠে বলল যে সে তাঁরই ভরসায় গ্রাম ছেড়ে এখানে চ'লে এসেছে। একদিন সে তাঁর কাছে যাবে।

"যেও—"

সদাশিব হাটে ঘুরতে লাগলেন। তিরমোহানীর হাটে ভালো পেঁপে পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। সেদিন কিন্তু পেঁপে দেখতে পেলেন না। অন্যান্য তরকারিওলার কাছে খবর পেলেন শিবুর একমাত্র ছেলেটি নাকি মারা গেছে দু'দিন আগে। শিবুই হাটে পেঁপে আনত।

"কি হয়েছিল তার ছেলের ?"

"মেয়াদী বোখার—"

টাইফয়েড জাতীয় কোনও জ্বর হয়েছিল সদাশিবের মনে হ'ল।

"কে দেখছিল ?"

"বিলাতী ডাক্‌টার দৎ সাহেব—"

সদাশিবের আত্মসম্মানে যেন একটু আঘাত লাগল। শিবুর বাড়ির অনেক অসুখ তিনি সারিয়েছেন। আজ শিবু বিলাতী ডাক্তার দৎ সাহেবের কাছে ছেলের চিকিৎসা করিয়েছে শুনে তাঁর খারাপ লাগল।

দৎ সাহেবের বয়স বেশী নয়, বিলেত থেকে সম্প্রতি ডি. টি. এম. পাস ক'রে এসেছেন। লোকটির চিকিৎসা-নৈপুণ্য আছে কিনা তা এখনও প্রমাণ-সাপেক্ষ, কিন্তু ব্যবসায়-নৈপুণ্য যে আছে তা ইতিমধ্যেই বেশ বোঝা গেছে। অনেক দালাল লাগিয়েছেন, তারা রোগী পিছু কমিশন পায়। তাদের আরও একটা কাজ হচ্ছে আকারে-ইঙ্গিতে প্রচার করা যে সদাশিবকে দিয়ে চিকিৎসা করানো নিরাপদ নয়। তিনি বুড়ো হয়েছেন, সেকেলে মতে চিকিৎসা করেন, অনেক কিছু ভুলেও গেছেন। এবং এই কারণেই 'ফি' নেন না, ওষুধের দামও দাবি করেন না। এই প্রচারে সদাশিবের অবশ্য ক্ষতি হয় নি, কারণ

তিনি লাভের আশায় প্র্যাকটিস করেন না। কিন্তু মাঝে মাঝে কষ্ট হয় তাঁর। মানুষের মনের বিচিত্র মতিগতি দেখে কৌতুকও অনুভব করেন।

…হাট থেকে যখন ফিরলেন তখন অনেক বেলা হ'য়ে গেছে। প্রায় দুটো। এসে দেখেন দ্বিজেনবাবু বসে' আছেন একটা নীল চশমা পরে'। দ্বিজেনবাবু একজন মোক্তার। সদাশিবের সঙ্গে তাঁর ক্বচিৎ দেখা হয়। প্রোটিন খাদ্যের মহার্ঘতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন—"আজকাল পাকা রুই সাড়ে তিন টাকা সের, মাংসও তাই। ভাল ডিম এক টাকায় সাতটা বা বড়জোর আটটা। দুধ টাকায় পাঁচ পো। তাই কিনে খাই, কি আর করব। যা রোজগার করি খাওয়াতেই যায়। ভিটামিনের জন্য ফলও খেতে হয় কিছু—লেবু, বেদানা এই সব। শসা-টসা আমার রোচে না। খেয়েই সর্বস্বান্ত হলাম মশাই"—বলেই অধরোষ্ঠের সহযোগে আক্ষেপসূচক 'মছ্'-গোছের একটা শব্দ করেন। তাঁর চেহারাটি কিন্তু খাদ্য-পুষ্ট নয়। চোখের কোল বসা, গালের হাড় উঁচু, নাকটা খাঁড়ার মতো। দেখলেই মনে হয় বুভুক্ষা যেন মূর্তিমতী হ'য়ে রয়েছে তাঁর চেহারায়!

"নমস্কার ডাক্তারবাবু, অনেকক্ষণ থেকে ব'সে আছি আপনার অপেক্ষায়—"

"নমস্কার। হঠাৎ এ সময়ে কেন?"

"চোখটাতে ভাল দেখতে পাচ্ছি না ক'দিন থেকে। নতুন বিলেত-ফেরত ডাক্তারটার কাছে গিয়েছিলাম, এক কাঁড়ি টাকা খরচ হ'ল খালি, চোখের তো কোনও উপকার দেখছি না।"

"বসুন দেখছি।"

তখনই ভাল করে' পরীক্ষা করলেন চোখটা। দেখে তাঁর যা মনে হ'ল তা বলতে পারলেন না তিনি দ্বিজেনবাবুকে। যে ব্যক্তি বরাবর

বড়াই করে' এসেছেন যে ভাল ভাল খাবার খেয়েই তিনি সর্বস্বান্ত তাঁকে কি ক'রে বলা যায় যে ভাল খাদ্যের অভাবেই তাঁর চোখের এই দশা হয়েছে। তাঁর মনে পড়ল তাঁর এক বন্ধু জ্ঞানবাবুর কথা। জ্ঞানবাবু একবার বলেছিলেন—"এটা সার জেনে রেখো পেট না মারলে মধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে পয়সা জমানো অসম্ভব। যারা মুখে বলে হাতী খাচ্ছি ঘোড়া খাচ্ছি তারা জেনো বাহাদুরি করছে। ছেলে পড়িয়ে, মেয়ের বিয়ে দিয়ে, বাড়িভাড়া গুনে আর লোকলৌকিকতা ক'রে কটা পয়সা বাঁচে যে খাবে? জান, অনেক বাড়িতেই দাই চাকর নেই, অনেক বাড়িতেই দুবেলা রান্না হয় না? সব জানা আছে আমার। সুতরাং পয়সা যদি বাঁচাতে চাও নোলাটি কমাও!"

জ্ঞানবাবুর এ সারগর্ভ উপদেশ সদাশিব পালন করেন নি। দ্বিজেনবাবুর চোখ দেখে জ্ঞানবাবুর কথাগুলো অনেকদিন পরে মনে পড়ল। হয়তো এতদিন লোকটা মিথ্যে বাহাদুরি ক'রে এসেছে।

"কি দেখলেন চোখে?"

"হ্যাঁ, একটু খারাপ হয়েছে। আপনি ডিম আর দুধ কি ভাবে খান?"

"দুধের ক্ষীর আর ডিমের ডালনা।"

"এগ্ ফ্লিপ্ করে' খাবেন। আধকাপ দুধে একটা কাঁচা ডিম মিশিয়ে তাই ঢক করে' খেয়ে ফেলবেন রোজ সকালে—"

"আঁশটে গন্ধ ছাড়বে যে—"

"নাক টিপে ওষুধের মতো খেয়ে নেবেন।"

"ওষুধ দেবেন না কিছু?"

"দিচ্ছি -"

সদাশিবের কাছে ভিটামিনের শ্যাম্পল্ ছিল নানারকম। সেইগুলোই দিয়ে দিলেন।

"আপাতত এইগুলো খেয়ে দেখুন। যদি না কমে অন্য ব্যবস্থা করা যাবে—"

"আপনার ফি—আর ওষুধের দাম—"

"না, ওসব দিতে হবে না। এখন আমি কেবল ডাক্তারি করি, ডাক্তারি ব্যবসা অনেকদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছি—"

"আচ্ছা, তাহলে চলি। অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার।"

দ্বিজেনবাবু চ'লে গেলেন।

আজবলাল আড়ালে এতক্ষণ 'টাইম্‌-বমে'র মতো চুপ করে' ছিল। দ্বিজেনবাবু চলে' যাবার পর বিস্ফোরণ হ'ল।

"মালতী দিদি চলে' যাবার পর থেকে আপনি বাবু শরীরের উপর বড়ই জুলুম লাগিয়েছেন। আমাকে শেষে জবাবদিহিতে পড়তে হবে।"

"দাও খাবার দাও—"

"চান করবেন না? গরম জল তৈরী আছে—"

"না থাক।"

এতে অসন্তুষ্ট হ'ল আজবলাল। তার চোখ দুটো ঈষৎ বিস্ফারিত হ'ল। এই না-চান-করাটাও সে শরীরের উপর আর একটা জুলুম ব'লে গণ্য করলে। কিন্তু কিছু বলতে সাহস করলে না আর। হন হন করে' ভিতরের দিকে চলে' গেল।

খেতে বসে' সদাশিব তাই লক্ষ্য করলেন, মালতী চলে' যাওয়ার পর থেকে যা রোজই লক্ষ্য করছেন। আজবলাল অনেক রকম রান্না করেছে,—মাছ, মাংস, লাউ, কুমড়ো, আলুর দম, শুক্তো, চচ্চড়ি, ডালনা, অম্বল কিচ্ছু বাদ দেয় নি। তার চেষ্টা মালতীর অভাবে তিনি যেন কষ্ট না পান। আজবলাল রাঁধে ভাল, কেবল তার মসলার হাতটা একটু বেশী। সে আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করে কোন্ তরকারিটা কেমন হয়েছে।

"মাংসটা সিদ্ধ হয়েছে তো বাবু? আজ মাংসটা খুব কচি ছিল না।"

"বেশ হয়েছে মাংস। খুব নরম হয়ে গেছে—"

"মাছের ঝালটা দেখুন তো, দিদিমণির মতো পেরেছি কি—"

"চমৎকার হয়েছে..."

প্রতিটি জিনিসের প্রশংসা না করলে আজবলাল মনে মনে দুঃখিত হয়। একবার খুব ঝাল হয়েছিল বলে' মাংসের বাটিটা সদাশিব ঠেলে দিয়েছিলেন, খান নি। আজবলালও খায় নি সেদিন। শুধু তাই নয়, তার পরদিন এসে বলেছিল—"আমি বুড়ো হয়েছি বাবু, সত্যিই আর রাঁধতে পারি না। আমাকে এবার ছুটি দিন।"

সদাশিব শুধু একটি কথা বলেছিলেন—"মালতী চলে' গেছে, সোহাগ চ'লে গেছে, তুমি যাবে? যেতে চাও, যাও। ওদের আটকাই নি, তোমাকেও আটকাব না।"

আজবলাল আর যায় নি। শুধু যে যায় নি তাই নয়, তারপর থেকে অপ্রত্যাশিত একটা পরিবর্তন ঘটেছে তার চরিত্রে। বহুদিনের কু-সংস্কার সে বর্জন করেছে। আজবলাল মুরগির মাংস ছুঁতো না। মুরগির মাংস মালতী রাঁধত আলাদা উনুনে। মালতী চ'লে যাওয়ার পর মাঝে মাঝে বাবুর্চি আনিয়ে সদাশিব মুরগি রান্না করিয়েছেন। হঠাৎ আজবলাল একদিন বললে—"বাবুর্চিকে ডাকবার দরকার নেই। আমিই পাখী রেঁধে দেব। রেঁধে না হয় চান করে' নেব। রোজ রোজ আপনার খাসির মাংস খাওয়ার দরকার নেই। মুরগি খেলে যখন ভালো থাকেন, আমি রেঁধে দেব—"

তারপর থেকে আজবলাল রোজ মুরগি রাঁধছে।

খেতে খেতে সদাশিব জিগ্যেস করলেন, "মহেন্দ্রবাবুর খাবার রোজ পাঠাচ্ছ তো?"

"হ্যাঁ। ছানা পাঠাই রোজ আধসের দুধের। উনি বলে' পাঠিয়েছেন ওঁর জন্যে আলাদা করে' ছোট মাছ পাঠাবার দরকার নেই। বাড়িতে যা রান্না হয় তাই পাঠালেই চলবে। ওঁকে মাছ মাংস সবই দিই—"

মহেন্দ্রবাবু মানে সেই 'হিপো', যাঁকে একদিন সদাশিব বেছে বেছে চারটি ছোট মাছ কিনতে দেখেছিলেন। এখন তিনি সদাশিবের চিকিৎসাধীন আছেন। সদাশিব তাঁকে আর বাজার করতে দেন না, আজবলালকে ব'লে দিয়েছেন তাঁকে যেন খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সদাশিবের মনে হ'ল অনেকদিন তাঁর খবর নেওয়া হয় নি। কেমন আছেন ভদ্রলোক কে জানে!

এগারো

খুব ভোরে সদাশিব বাড়ির সামনে 'লনে' চুপ ক'রে ব'সে থাকেন। কিছু করেন না, কেবল পা দোলান আর ব'সে ব'সে চেয়ে দেখেন চারিদিকে। পাখী, ফুল, গাছ, আকাশ, চিরপুরাতন তাঁর এই সঙ্গীরা নিত্য-নূতন আনন্দ দেয় তাঁকে। লনে বসেই চা খান এবং চা খাওয়ার পরও চুপ ক'রে ব'সে থাকেন তাঁর ড্রাইভার আলী যতক্ষণ না আসে। আলী এলেই বেরিয়ে যান তিনি।

সেদিন ভোরে ছিপলি এসেছিল, কিছু মাছ আর তার স্বামীকে নিয়ে। সদাশিব দেখলেন ছিপলির স্বামীর হুক্‌ওয়ার্মের চিকিৎসা ক'রে স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হয়েছে। আগে চোখ মুখ বিবর্ণ ছিল, এখন একটু রক্তের আভাস দেখা দিয়েছে। ছিপলি কিন্তু বললে ওর 'তাগত' নেই কিছু। হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন সদাশিব। ছিপলিকে

বললেন, "তুই মাছগুলো নিয়ে বাড়ির ভিতর যা। আমি দেখছি একে। আজবলালের কাছ থেকে বঁটি নিয়ে মাছগুলো বেছে দিগে যা।"

ছিপলির স্বামীকে মৃদুকণ্ঠে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন সদাশিব। ছিপলির স্বামী অপ্রতিভ মুখে কাচুমাচু হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর সত্য কথা বলল। লোকটা পারুষ্য-হীন। পূর্ণ যুবতী হাস্যমুখী ছিপলির ঢলঢলে চেহারাটা ফুটে উঠল সদাশিবের মানসপটে।

"নাম কি তোমার ?"

"জিতু—"

"তোমার যে অসুখ হয়েছে তা তো বাপু চট্ ক'রে সারবে না। এর জন্যে যে সব ইন্‌জেক্‌শন নিতে হবে তার দামও অনেক। তুমি কি পারবে ?

"ঘটি বাটি বন্ধক দিয়ে টাকা যোগাড় করতে হবে। কত টাকা লাগবে—?"

"আমি ওষুধের নাম লিখে দেব। তুমি দোকানে গিয়ে খোঁজ কর কত দাম লাগবে—"

"আচ্ছা যদি অসুখ সেরে যায় তাহলে আমি যেমন ক'রে হোক ওষুধের দাম জোটাব—"

"আচ্ছা তুমি বস। আমি ওষুধের নাম লিখে দিচ্ছি। ছিপলি আসুক—"

জিতু একধারে বিমর্ষ মুখে ব'সে রইল। সদাশিবও একটু দ্বিধায় পড়ে গেলেন। তাঁর অভিজ্ঞতায় এ অসুখ প্রায় দুরারোগ্য। ওষুধও দুর্মূল্য। এ অবস্থায় এই গরীব লোকটাকে কি এত খরচের মধ্যে ফেলা উচিত হবে ?

ছিপলি একটু পরে বেরিয়ে এল :

তাকে স্পষ্ট কথাই বললেন সদাশিব—"তোর স্বামীর যা হয়েছে তা প্রায় সারে না। একরকম ইন্‌জেক্‌শন আছে, তাতে কিছু উপকার হতেও পারে, না-ও হ'তে পারে। তোমরা যদি সে ইন্‌জেক্‌শন কিনতে পারো, তাহলে উলফৎ সে ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে দেবে, পয়সা নেবে না। ওষুধটা কিন্তু কিনতে হবে। আমার কাছে নেই—"

"বেশ, লিখে দিন, কিনে নেব—"

ওষুধের প্রেসক্রিপশন নিয়ে ছিপলি আর তার স্বামী চ'লে গেল।

ওরা চ'লে যাবার পর সদাশিব ভাবতে লাগলেন। জিতুর অসুখ যদি না সারে, তাহলে কি হবে? আইনতঃ ছিপলি তার স্বামীকে ত্যাগ ক'রে অন্য বিবাহ করতে পারে। কিন্তু ছিপলি কি তা করবে? মনে হয় ওর স্বামীকে ও ভালবাসে। দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে বলেই সব ভালবাসা উবে যাবে? কেবল আইন বা শাস্ত্র মেনে চললেই কি মানুষ সুখী হয়? কি জানি ওর কিসে সুখ হবে।

বহুদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ল। ভবদেববাবুর স্ত্রী সাবিত্রীর কথা। ভবদেববাবুরও কোনও পারুষ্য ছিল না। সাবিত্রী দেবী সাবিত্রী নামের মর্যাদা রাখতে পারেন নি। অনেক প্রণয়ী ছিল তাঁর। ভবদেববাবুও জানতেন এ কথা, কিন্তু কিছু বলতেন না। স্ত্রীকে ভয় করতেন তিনি, সর্বদাই যেন তাঁর কাছে অপরাধী হ'য়ে থাকতেন। আড়ালে সকলেই ভবদেববাবুকে নিয়ে পরিহাস করতেন। নিজেকে একরকম হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলার চেয়ে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করা ঢের ভাল।

আজবলাল চা নিয়ে এল।

চায়ের টেবিল সাজিয়ে দিয়ে সে কুণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল একধারে।

"তুমি যাও, আমি নিজে ছেঁকে নেব—"

"একটা কথা ছিল বাবু। আমি মাসখানেকের জন্যে বাড়ি যেতে চাই। দেশে আমাদের কিছু জমি আছে, আমার ভাইপোটাই এতদিন সব দেখাশোনা করত। কিন্তু সে পুলিসের চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে' গেছে, বাড়িতে কেউ নেই, আমি একবার বাড়ি না গেলে সব বরবাদ হ'য়ে যাবে। আমি রামলক্ষ্মণ ঠাকুরকে বলছি এখানে এসে কাজ করবে।"

"এখান থেকে যদি কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও কোনও ব্যবস্থা হ'তে পারে না ?"

"শুধু টাকা পাঠালে কিছু হবে না। আমাকে নিজে যেতে হবে। জমিগুলো ভাগে বন্দোবস্ত করে' দিয়ে আসব। যাবার সময় আমাকে কিছু টাকাও নিয়ে যেতে হবে।"

সদাশিব কয়েক মুহূর্ত চুপ করে' রইলেন।

তারপর বললেন, "বেশ—"

চা খেয়ে সদাশিব চুপ করে' বসে' রইলেন। কাগজওলা কাগজ দিয়ে গেল। আলী এসে সেলাম করে' গাড়ির চাবি নিয়ে গাড়ি বার করল। সদাশিব চুপ করে' বসে' রইলেন। সোহাগ গেছে, মালতী গেছে, আজ আজবলালও চলল। ও বলছে বটে ফিরে আসবে, কিন্তু খুব সম্ভবতঃ ফিরবে না। দেশে ওর ভাইপো ছিল বলেই এতদিন ও একটানা এখানে থাকতে পেরেছিল। আর থাকবে না। হঠাৎ যেন তিনি চমকে উঠলেন। মনে হ'ল মনু সামনে দাঁড়িয়ে আছে! তাঁর দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। পরমুহূর্তেই কিন্তু আর দেখতে পেলেন না। চোখের ভুল ? কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে! অনেকক্ষণ নির্বাক হ'য়ে বসে' রইলেন তিনি। তারপর তাঁর সমস্ত হৃদয় অদ্ভুত একটা সান্ত্বনায় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল। তাঁর বিশ্বাস হ'ল আর কেউ না থাক মনু তাঁর কাছাকাছি আছে এবং চিরকাল থাকবে।

বারো

নবাগঞ্জের হাটের কাছে সেই বড় দীঘিটার ধারে চেয়ার টেবিল পেতে বসেছিলেন সদাশিব। দীঘির ধারে জগদীশ কুঁজড়ার বাড়ি। অপারেশন করবার পর জগদীশ ভাল হ'য়ে গেছে। আজবলাল চলে' যাওয়ার পর থেকে তিনি দুপুরে আর বাড়িতে খেতে যান না। আলীর সহায়তায় বাইরেই কোথাও না কোথাও রান্না করে' নেন। আলীও রাঁধে ভালো। তাছাড়া যেখানে রান্না করা হয় সেখানে আশেপাশে তাঁর চেনা রোগী থাকেই। তারাও এসে আলীকে সাহায্য করে। সেদিন জগদীশের বউ ছেলেমেয়েরা আলীর সহকারী হয়েছিল। কেউ মসলা বেটে দিচ্ছে, কেউ জল তুলে আনছে, কেউ তরকারি কুটে দিচ্ছে। নতুন-ধরনের এক যাযাবর জীবন যাপন করছেন সদাশিব। রোজই কোথাও না কোথাও যেন পিক্‌নিক হচ্ছে।

সদাশিব ডায়েরি লিখছিলেন।

"আজবলাল আর ফেরে নি। লিখেছে তার জমি নিয়ে বড্ড বেশী জড়িয়ে পড়েছে, তার এক জ্ঞাতি নাকি তার সঙ্গে মকদ্দমা করছে জমির মালিকানা স্বত্ব নিয়ে। লিখেছে মকদ্দমা শেষ হলেই ফিরে আসবে। আমি জানি আসবে না। জমির মকদ্দমা সহজে মেটে না।

"মালতীর খবরও পাই মাঝে মাঝে। উত্তরপ্রদেশের তীর্থগুলি একে একে দেখে বেড়াচ্ছে। কোন কোন জায়গায় থেকেও যাচ্ছে বেশ কিছুদিন। চিরঞ্জীব লিখেছে মালতী অনেক ভালো আছে। 'ফিট্‌' আর হয় নি। মালতী নাকি প্রত্যেক তীর্থস্থানে গিয়ে মন্দিরেই অধিকাংশ সময় কাটায়। চিরঞ্জীবই একটু মুশকিলে পড়েছে। তার

ধর্মে তেমন মতি নেই। লিখেছে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকগুলো আবার পড়তে শুরু করেছি। আরও লিখেছে—টাকা যদি বাঁচে কাশ্মীরটা দেখে আসবার ইচ্ছে আছে। আমি তাকে লিখে দিলাম টাকার জন্যে ভেবো না, কাশ্মীর বেড়িয়ে এস। যারা যেখানে থেকে সুখী থাকে থাক। আমার জন্যে কেউ যেন কষ্ট না পায়।

"সোহাগরাও বোধহয় শেষ পর্যন্ত বিলেতেই থাকবে। লিখেছে বছরে একবার আমার সঙ্গে এসে দেখা করে' যাবে। প্লেনে আসতে যেতে বেশী সময় লাগবে না। আসে যদি ভালই, না-ও যদি আসে তাতেই বা ক্ষতি কি! কারো জন্যে কিছু আটকায় না। ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়ছে। আমাদের গ্রামের বাড়িতে একটা ঝুমকোলতা ছিল। বাঁশের একটা মাচার উপর ভর করে' অজস্র ফুল ফোটাত সে। একদিন ঝড় হ'য়ে তার মাচাটা পড়ে' গেল। নূতন মাচা আর কেউ করে' দিলে না তাকে। লতাটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে' রইল দু'চারদিন। পাশেই ঝোপঝাড় ছিল কতকগুলো বুনো গাছের, লতাটা ক্রমশঃ সেই দিকে তার ডালপালা বিস্তার করতে লাগল। বছরখানেক পরে কলেজের একটা ছুটিতে দেশের বাড়িতে গিয়েছিলাম, দেখি ভাঙা মাচাটা অন্তর্ধান করেছে, কিন্তু ঝুমকোলতাটা সগৌরবে বেঁচে আছে তখনও। পাশের ঝোপটা আশ্রয় করেই অজস্র ফুল ফোটাচ্ছে। ঝোপেঝাড়ে খ্যাতিহীন অন্য ফুলও ফুটেছে অনেক। অনেক বুনো-লতাও জড়িয়ে গেছে ঝুমকোলতাটার সঙ্গে। তাদেরও ফুল ফুটেছে। তাদের দলে ঝুমকোলতাকে কিছু বেমানান মনে হয় নি। মাচার আশ্রয় হারিয়ে ঝুমকোলতা মরে' যায় নি, নূতন আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে, সেইখানেই সার্থক করেছে নিজেকে।

"আমার জীবনের মাচাও বারবার বদলেছে। বারবার বদলির চাকরি করেছি, আজ-এখানে-কাল-ওখানে করেই কেটেছে জীবনের

বেশীর ভাগ। পুরাতনকে ছেড়ে নূতনের কাছে বারবার গেছি, তার সঙ্গে নূতন বন্ধনে বাঁধা পড়েছি, পুরাতন বিস্মৃতির তলায় চাপা পড়েছে। সেই নূতনও পুরাতনে বিলীন হয়েছে আবার, তাকে আঁকড়ে বেশী দিন থাকতে পারি নি। এর নামই জীবন। আমার জীবনের মঞ্চে যাদের স্থায়ী সম্পদ বলে' মনে হয়েছিল আজ দেখছি তারাও একে একে সরে' গেছে। চিরঞ্জীব, মালতী, সোহাগ আজ কোথায়? মন্নু অনেক আগেই চলে' গেছে। সেদিন সকালে তার যে আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেছিলাম সেটা বোধহয় আমার অবচেতন মনেরই সৃষ্টি। আমার যে কামনা মনের নিগূঢ় লোকে বসে' তাকে চাইছে, সেই কামনাই হয়তো মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল সেদিন। কই, আর তো তাকে কোনদিন দেখি নি। ওদের চিন্তা, ওদের সুখদুঃখ আগে আমাকে বিচলিত করত এখন তো আর করে না। আমার গাড়ি ওদের স্টেশন ছেড়ে চলে' এসেছে। এখন নূতন স্টেশনে নূতন লোকের ভিড়। মন তাদের নিয়েই ব্যাপৃত আছে। আজ কেব্‌লি, ছিপলি, গীতা, জগদীশ এদের সুখদুঃখেই আমি বেশী আন্দোলিত।

"কেব্‌লির স্বামী নারান আমাকে এড়িয়ে চলছে। দেখা হবেই কোথাও-না-কোথাও। আলীকে বলেছি তাকে খবর দিতে। ছিপলির স্বামী জিতু ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে ভালো আছে বলছে। আমার কিন্তু মনে হয় না ও সেরে যাবে। যদি কিছু উপকার হ'য়ে থাকে সেটা সাময়িক। ছিপলির হাতে রূপোর খাড়ু ছিল, এখন সেগুলো নেই দেখছি। সম্ভবতঃ ওষুধ কেনবার জন্য সেগুলো বেচে দিয়েছে। আমি ওকে বলেছিলাম আমি ওষুধ কিনে দিচ্ছি, তুই পরে টাকা দিয়ে দিস। কিন্তু ছিপলি তাতে রাজী হয় নি। বলেছিল, টাকার বন্দোবস্ত আমরা করেছি।

"আশ্চর্য মেয়ে এই ছিপলি। সদা হাস্যমুখী, উদয়াস্ত পরিশ্রম

করে। চালচলন দেখে মনে হয় ভ্রষ্টা নয়। ওর সঙ্গে হাসিঠাট্টা অনেকে করে বটে কিন্তু মনে হয় তার বেশী আর কেউ অগ্রসর হ'তে পারে না। ছবিলাল মোড়লের ছেলে একদিন বাজারে ওকে কি একটা অশ্লীল ইঙ্গিত করেছিল। ছিপলি বঁটি নিয়ে তেড়ে গিয়েছিল তাকে। বলেছিল, তোর নাক কেটে দেব। তা ও পারে।

"গীতার সেই বাভন মহাজন সেদিন এসেছিল তার দলিলপত্র নিয়ে। দেখলুম গীতার স্বামী জিতু বহুদিন আগে দু'শ' টাকা নিয়েছিল। দু'বছর ধরে' ওরা স্বামী স্ত্রী ওর বাড়িতে বিনা বেতনে খেটেছে, কিন্তু ধার এখনও শোধ হয় নি। বাভন বলছে এখনও দেড়শ' টাকা বাকি আছে। আমি আর ও নিয়ে কচলাকচলি না করে' টাকাটা দিয়ে দিয়েছি ওকে।

"গীতা বলেছে দুধ দিয়ে আর ঘুঁটে দিয়ে টাকাটা শোধ করে' দেবে। আমি তাতেই রাজী হয়েছি। আর একটা প্রস্তাব করেছিল গীতা, তাতে আমি রাজী হই নি। সে বলেছিল, মালতী দিদি তো এখন নেই, তিনি যতদিন না আসেন আমি আপনার বাড়িতে কাজকর্ম করে' দেব। বাড়িতে কোনও মেয়েছেলে নেই, আপনার হয়তো কষ্ট হচ্ছে। এ প্রস্তাবে রাজী হই নি আমি। এমনই তো আমার নামে নানারকম নিন্দা রটিয়ে থাকেন আমার তথাকথিত বন্ধুরা। গীতার মতো এক রূপসী যুবতী যদি আমার বাড়িতে ঘুরঘুর করে তাহলে তো খই ফুটবে সকলের মুখে।

"...এদের কেন্দ্র করেই নূতন জীবন গ'ড়ে উঠেছে আবার। বাঁচবই বা আর ক'দিন? শমনের নোটিশ এসে গেছে। ইউরিনে অ্যালবুমেন দেখা দিয়েছে, ব্লাডপ্রেসারও বেড়েছে। এর চিকিৎসা হচ্ছে সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে হিন্দুবিধবার আহার খেয়ে জড়ভরতের মতো প'ড়ে থাকা। তা আমি পারব না। জীবন্মৃত হ'য়ে থাকার

চেয়ে ম'রে যাওয়া ঢের ভালো। ম'রে না গিয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে থাকলে অবশ্য শোচনীয় ব্যাপার হবে সেটা। কিন্তু যারা খুব নিয়মে থেকেছে এরকম লোকেরও তো পক্ষাঘাত হ'তে দেখেছি…"

সদাশিবের লেখায় বাধা পড়ল।

জগদীশের ছোট মেয়ে ফুদিয়া ছুটে এসে জিগ্যেস করলে, "মা ঠেকুয়া বানিয়েছে, খাবেন ?"

"নিশ্চয় খাব। তবে একটার বেশী নয়—"

সুসংবাদ বহন ক'রে ছুটে চ'লে গেল ফুদিয়া।

ডাক্তারবাবু তাদের বাড়ির তৈরি ঠেকুয়া খাবেন এটা যেন একটা আশাতীত ব্যাপার।

আলী এসে চুপি চুপি বললে—"হুজুর, খানা তো পক্ গিয়া। আভি খাইয়ে গা ?"

"একটু পরে খাব—"

"তব্ হম্ নারানকো পকড়কে লে আবেঁ ?"

"নারানকো কোথা পাবে এখানে ?"

"বহ্ দেখিয়ে, খাপরা ছা রহা হ্যয়—"

আলী একটু ঝুকে ডানহাতের তর্জনী-মধ্যমা একত্র ক'রে দুটো গাছের ফাঁকের ভিতর দিয়ে দেখাতে লাগল। সদাশিব দেখতে পেলেন একটা খাপরার ঘর ছাওয়া হচ্ছে।

"ডেকে নিয়ে এস—"

আলী চ'লে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাইক ক'রে এসে হাজির হ'ল ফালতু।

কমলের কারখানার অ্যাপ্রেন্টিস্।

"হুজুর, মুর্গ মসল্লম্ ভেজ্ দিহিন কমলবাবু—"

কমলের একটা চিঠিও ছিল।

"ডাক্তারবাবু, আপনার জন্যে একটা মুর্গ মসল্লম্ পাঠালাম। আপনি খেলে বিশেষ আনন্দিত হব। ফালতুকে বলেছি আপনি যেখানেই থাকুন সে আপনাকে খুঁজে গিয়ে দিয়ে আসবে—"

"তুই কি ক'রে খোঁজ পেলি যে আমি এখানে আছি?"

"উলফৎ বললে—"

ফালতুর বুদ্ধি দেখে প্রীত হলেন সদাশিব। তাঁর দৈনন্দিন গতিবিধি যে উলফৎই জানে একথা ফালতু কি ক'রে জানল? খুশী হলেন সদাশিব। ফরসা লম্বা কিশোর ছেলেটির মুখের দিকে হাসি-মুখে চেয়ে রইলেন। ফালতুরও চোখের দৃষ্টি হাস্য-প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল। সদাশিব পকেট থেকে একটা টাকা বার ক'রে দিতে গেলেন তাকে।

"নেহি হুজুর—"

সেলাম করে' সরে' দাঁড়াল সে মুচকি হাসতে হাসতে। তারপর গাড়িটার কাছে গিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

"পিছেকা চাক্কা মে হাওয়া নেহি হ্যয়!"

"পাম্প ক'রে দাও—"

"আলী কাঁহা?"

"সে আসছে এখুনি। সে এসে পাম্প বের ক'রে দেবে। তুই এখানেই খেয়ে যা—"

ফালতু হেসে একবার চাইলে তাঁর দিকে, যেন এমনই একটা কিছু প্রত্যাশা করছিল সে। তারপর সে গাড়িটাকেই প্রদক্ষিণ করে ঘুরতে লাগল যদি আরও কিছু গলদ চোখে পড়ে। হঠাৎ সদাশিব লক্ষ্য করলেন তার কামিজটা বড্ড ছেঁড়া। পিঠের মাঝামাঝি লম্বা-লম্বি ছিঁড়ে গেছে। তিনি একটা কাগজে একটা চিঠি লিখে ফালতুকে বললেন—"তুই যখন ফিরে যাবি তখন বাজারে হরিকিষুণবাবুর দোকানে এই চিঠিটা দিয়ে দিস—"

"কাপড়াকা দোকান যিন্‌কা হ্যয় ?"

"হাঁ—"

সদাশিব হরিকিষুণবাবুকে লিখে দিয়েছিলেন ফালতুকে ফালতুর গায়ের মাপে একটা কামিজ তিনি যেন দিয়ে দেন। তিনি দাম পরে পাঠিয়ে দেবেন। ফালতুকে সে কথা আর বললেন না। যদি না নেয়! ওদের আত্মসম্মান জ্ঞান খুব বেশী।

একটু পরেই আলীর সঙ্গে নারান এসে হাজির হ'ল। নারানের রং নিকষ-কৃষ্ণ, শরার বেশ বলিষ্ঠ। মনে হয় কষ্টিপাথর কুঁদে কোনও শিল্পী যেন সৃষ্টি করেছে ওকে। যেন একটা কাফ্রী অসুর। তার চলনে এবং দৃষ্টিতে একটা মার্জার-সুলভ ভাব আছে। এদিক ওদিক চেয়ে ঈষৎ হেলে ছলে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলাফেরা করে, দেখলেই চোর বা ডাকাত ব'লে সন্দেহ হয়।

"কি নারান, শুনছি তুমি বিয়ে করতে চাইছ আবার—"

"জি হুজুর—"

নারান বেশ সপ্রতিভভাবেই উত্তর দিলে।

"কেব্‌লি তো আছে, আবার বিয়ে কেন—"

"ভিতর মে বাত্‌ ছে হুজুর—"

ছেকা-ছিনি ভাষায় আলাপ হ'ল। তার মর্মার্থ এই।

"ভিতরে আবার কি কথা আছে ?"

"কেব্‌লির যে ছেলেপিলে হয় নি। আমার বংশ লোপ পেয়ে যাবে যে—"

"কিন্তু এতে কেব্‌লির মনে কষ্ট হবে না ?—"

"ছু'দিন কষ্ট হবে। তারপর ঠিক হ'য়ে যাবে। আমাদের সমাজে তো এরকম আখছার হচ্ছে। তাছাড়া আর একটা কথা আছে। আমি যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি সে বিধবা। তার আগেকার স্বামীর

জমিও পেয়েছে। তাই ওর বাবা বলেছে যে কেব্‌লিকে ও দু' বিঘে জমি লেখাপড়া ক'রে দিয়ে দেবে। এতে কেব্‌লির আখেরে সুবিধে হবে কত।"

"কিন্তু তোমার বদলে দু' বিঘে জমি পেলে কি কেব্‌লি সুখী হবে? হবে না। ও তোমাকে খুব ভালবাসে। এটা জেনে রেখ ওর জন্যেই তুমি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছ। ওর মনে কষ্ট দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? আর ছেলে না-হওয়ার কারণ যদি তোমার মধ্যে থাকে, তাহলে হাজারটা বিয়ে করলেও তোমার ছেলে হবে না—"

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল নারান।

তারপর বলল. "আচ্ছা, আমি ভেবে দেখব—"

"হ্যাঁ, আর একটা কথা শোন। কেব্‌লিকে তুমি মারধোর করেছ কেন?"

নারানের চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

"না, মারব কেন। মারি নি তো। আমি কিচ্ছু করি নি।"

"কিন্তু ওর মাথায় রক্ত দেখলাম যে—"

"ও মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে নিজেই রক্ত বার করেছে কপাল থেকে। আমি কি করব!"

"তাই না কি!"

কেব্‌লি-চরিত্রের আর একটা দিক সহসা প্রতিভাত হ'ল সদাশিবের কাছে। তিনি নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলেন কেব্‌লি নারানকে কতটা ভালবাসে। তাঁর ভয় হ'ল নারান বিয়ে করলে কেব্‌লি আত্মহত্যা ক'রে বসবে না তো?

"আমি এবার কাজে যাই হুজুর?"

"যাও। কথাটা ভেবে দেখো—"

"জি হুজুর।"

কিন্তু নারানের মুখভাব দেখে সদাশিবের মনে হ'ল ও বিয়ে করবেই।

"খানা ঠাণ্ডা হো রহা হুজুর—"

ফিসফিস ক'রে আলী এসে বললে।

"হ্যাঁ এবার খেতে দাও—"

আলী প্লেট সাজাতে লাগল।

জগদীশের দুই ছেলে এক মেয়েও খেতে বসল। ফালতুও। একটু পরে জগদীশ এসে বসল একধারে।

"আমাকে আর কতদিন ঘরে বসিয়ে রাখবেন ডাক্তারবাবু, আমি তো ভালো হ'য়ে গেছি। হাটে না গেলে পেট চালাব কি ক'রে?"

"তোমার বউ হাটে যাক না—"

"ও বড় সরমিলা (লাজুক), কোথাও যেতে চায় না। যাওয়াও মুশকিল। আজকালকার ছোঁড়াগুলো বড় পাজি। রাস্তায় জোয়ান মেয়ে দেখলেই পিছু নেয়—"

"আর সাত দিন কোনরকম ক'রে কাটিয়ে দাও। অতবড় অপারেশন হয়েছে, ভারী ভারী মোট তোলা এখন চলবে না—"

জগদীশ চুপ ক'রে রইল।

"আর কাউকে বলো না তোমার তরি-তরকারিগুলো নিয়ে বেচে দিক—"

"বিরজু নিয়ে যায়। কিন্তু হিসেব ঠিক দেয় না। সেদিন কুড়িটা কদ্দু (লাউ) বিক্রি ক'রে মাত্র আড়াই টাকা এনেছে। চার আনার কম কি কোন কদ্দু বিক্রি হয়? অথচ ওকে কিছু বলা যায় না, গোতিয়া (জ্ঞাতি)—"

"আর সাতটা দিন কাটিয়ে দাও কোনরকমে।"

সদাশিব যে এখানে এসে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তার একটা

কারণ, তিনি এখানে খেলে ওরাও খেতে পাবে। সে কথাটা প্রকাশ্যে ওদের বলেন নি। কিন্তু আলীকে গোপনে ব'লে দিয়েছেন। আলী বেশী বেশী ক'রে রান্না করেছে। পাছে ছোঁয়া যায় ব'লে ভাত ডালটা জগদীশের বউই নাবিয়ে দিয়েছে। কিছু নটে' শাক সে সকাল বেলাই তুলে রেখেছিল তাই ভেজেছে, আর লাউয়ের তরকারি করেছে একটা। ডাল আর আচার সহযোগে এই এদের কাছে রাজভোগ। ডাল ভাতই প্রচুর পরিমাণে জোটানো শক্ত, রোজ জোটে না। সদাশিব ক'দিন থেকে এখানে খাচ্ছেন ব'লে পেট ভরে' খেতে পাচ্ছে ওরা।

…খাওয়া-দাওয়ার পর গাছতলায় ইজি-চেয়ারটা পেতে শুয়ে পড়লেন সদাশিব। বরাবরই দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁর শোয়া অভ্যাস। এই সেদিন পর্যন্ত পালঙ্কের উপর কোমল শুভ্র বিছানায় ইলেক্‌ট্রিক পাখার তলায় ঘুমিয়েছেন। ইচ্ছে করলে এখনও ঘুমুতে পারেন। কিন্তু এখন আর ইচ্ছেই করে না। গাছতলায় খোলা হাওয়ায় ফোল্ডিং ক্যাম্প-চেয়ারে শুয়েই বেশী আনন্দ পান এখন। দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলেন মনু এসেছে। হেসে বলছে, কাশী গিয়েছিলাম, খুব ভালো জর্দা এনেছি। ঘুমটা ভেঙে গেল। মনু যে জর্দা খেত একথা তাঁর মনেই ছিল না।

তেরো

নবীপুর হাটে সদাশিব সেদিন একটা নাটকীয় কাণ্ড ক'রে বসলেন। ডাক্তারি-বিদ্যার প্রয়োগ হিসাবে তাতে অসাধারণত্ব কিছুই ছিল না। কিন্তু হাটসুদ্ধ লোক চমৎকৃত হ'য়ে গেল, হাট ভেঙে যাবার উপক্রম হ'ল প্রায়। সবাই রাধাকিষুণ বাবাজিকে ঘিরে দাঁড়াল এসে।

লোকটির নাম রাধাকিষুণ নয়, মঙ্গলদাস। কিন্তু সকলেই তাকে রাধাকিষুণ ব'লে ডাকে কারণ রাধাকিষুণ বললে সে ক্ষেপে যায়। প্রকাণ্ড একটা টিকি আছে মঙ্গলদাসের। রাস্তায় বেরুলেই ছেলের দল তার পিছনে লাগে—'টিকৃকি মে রাধাকিষুণ' 'টিকৃকি মে রাধাকিষুণ'—বলতে বলতে ছোটে পিছু পিছু। মঙ্গলদাস দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে যায় তাদের। তারা হৈ হৈ ক'রে হাসতে হাসতে দুড়দাড় ক'রে ছুটে পালায় এ খেলা অনেকদিন থেকে চলছে। অনেকে বলে ওই তেড়ে যাওয়াটা মঙ্গলদাসের মেকি রাগ-দেখানো, আসলে ও ছেলেদের মুখে রাধাকিষুণ নামটা শুনতেই চায় বারবার। বাইরে সে কালী-সাধক। টিকিতে জবাফুল বাঁধা থাকে। কপালে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। লোকে বলে মঙ্গলদাস খুব চালাক লোক। বাইরে সে কালী পূজো করে, আবার ছেলেদের মুখ থেকে রাধাকৃষ্ণের নামটাও শুনে নেয়। গাছেরও খায় তলারও কুড়োয়।

ইদানীং কিছুদিন থেকে মঙ্গলদাসকে আর পথে-ঘাটে দেখা যাচ্ছিল না। তার কারণ সে একটি সাধনসঙ্গিনী জুটিয়ে কামরূপে গিয়ে সাধনা করছিল নাকি। কিন্তু সেখানে আর একটি বেশী শক্তিশালী সাধক ছিলেন। মঙ্গলদাসের সাধন-সঙ্গিনী তাঁর খপ্পরে গিয়ে পড়ল। মঙ্গলদাস হতাশ হ'য়ে ফিরে এসেছে দিন কয়েক আগে। শুধু যে সাধন-সঙ্গিনীকে হারিয়েছে তা নয়, স্বাস্থ্যটিকেও হারিয়েছে। অতিরিক্ত 'কারণ' পান করার ফলে লিভারটি গেছে। প্রকাণ্ড উদরী হয়েছে এখন। সদাশিবের কাছে মঙ্গলদাস এসেছিল কয়েকদিন আগে। সদাশিব বলেছিলেন এ রোগ সারবে না। তবে পেটের জলটা বার ক'রে দিলে কিছুদিন আরামে থাকবে। নবীপুরে মঙ্গলদাসের বাড়ি। সদাশিব হাটে এসে দেখলেন বিরাট পেট নিয়ে মঙ্গলদাস ব'সে আছে।

"পানি নিকাল দিজিয়ে হুজুর। জান যা রহা হ্যয়।"

সদাশিব বললেন, "আচ্ছা, একটা বালতি আনাও। কত জল বেরুবে সেটা দেখতে হবে।"

বালতি যোগাড় হ'য়ে গেল একটা। তারপর সদাশিব তার ব্লাডপ্রেসার আর নাড়ি দেখলেন। ধী-বিশাল পাণ্ডের দোকানে বড় চৌকো-গোছের টুল ছিল একটা। সেইটের উপর বসালেন মঙ্গলদাসকে। তারপর পেটের নীচের দিকে একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে অসাড় ক'রে দিলেন জায়গাটাকে। তারপর পট্‌ ক'রে মোটা একটা ট্রোকার দিয়ে ছ্যাঁদা ক'রে দিলেন। পিচকিরির মতো জল বেরুতে লাগল আর পড়তে লাগল বালতিতে। দেখতে দেখতে ভিড় জ'মে গেল চারিদিকে। সে এক হৈ হৈ কাণ্ড।

মঙ্গলদাস চোখ বুজে ব'সে ছিল।

হঠাৎ সে চোখ খুলে বললে—"নাম শুনাও। বিরিঞ্চিয়াকে খবর দেও।"

একটু পরে বিরিঞ্চিয়ার দলবল খোল মাদল আর খঞ্জনি নিয়ে এসে হাজির হ'য়ে নাম শোনাতে লাগল মঙ্গলদাসকে। "জে জে রাধা, জে জে কিষুণ, জে জে রাধা, জে জে কিষুণ"—জে জে মানে জয় জয়। সদাশিব বাধা দিলেন না, উপভোগ করতে লাগলেন।

সদাশিবের একটু পরে চোখে পড়ল ভিড়ের মধ্যে ছিপলিও দাঁড়িয়ে আছে। আর ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে তিনটে বখা গোছের ছোঁড়া। প্রত্যেকেরই মাথায় বাহারে তেড়ি, চোখে রঙীন চশমা, পরনে হাওয়াই শার্ট আর ঢিলে পাজামা। কথায় কথায় ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ ক'রে হাসছে।

ওদের মধ্যে দু'জনকে চিনতে পারলেন সদাশিব।

একজন স্থানীয় এক ডাক্তারের ছেলে। জাতে সোনার বেনে। ঠাকুর্দা তেজারতি করে' বড়লোক। জমিদারি কিনেছে। এ ছোকরার

কলেজে নাম লেখানো আছে। প্রফেসারদের ঘুষ দিয়ে কিম্বা হুমকি দিয়ে পরীক্ষা পাস করে' যায়। সেদিন দলবল নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে একটা দোকান লুট করেছে। পুলিস এদের কিচ্ছু বলে না। সবাই টাকার বশীভূত।

দ্বিতীয় ছোকরা ছবিলাল মোড়লের ছেলে। ছবিলাল একজন কংগ্রেস-অনুগৃহীত ব্যক্তি। সুতরাং ছেলেটি একটি অকুতোভয় গুণ্ডা। এর প্রধান কাজ হচ্ছে পরের পাঁঠা চুরি ক'রে খাওয়া। গরীব মানুষেরা প্রায়ই ছাগল পোষে, ছাগলের বাচ্চা এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ায়। এ ছোকরা সুবিধে পেলেই গ্রাস করে সেগুলি। ওদের পাড়ার গরীব লোকেরা অস্থির হ'য়ে উঠেছে ওর জ্বালায়। অথচ ভয়ে মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে পারে না। পুলিস ওদের সহায়।

তৃতীয় ছোকরাটিকে সদাশিব চিনতে পারলেন না।

ওরা খুব সম্ভবতঃ ছিপলিকে নিয়েই হাসাহাসি করছিল। ছিপলির কুঞ্চিত ভ্রূ এবং অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি দেখে তাই অনুমান করলেন সদাশিব। ছিপলি ভিড় ঠেলে ঠেলে ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে লাগল, শেষে তাঁর চেয়ারের ঠিক পিছনে এসে দাঁড়াল। হো হো ক'রে হেসে উঠল ছোকরা তিনটে।

একজন বলে' বসল—"বুড্‌ঢার কাছে গিয়ে কি মজা পাবে সহেলি— !"

ছিপলির মুখ লাল হ'য়ে উঠল। সদাশিব গম্ভীর হয়ে' বসে' রইলেন। তারপর উঠে মঙ্গলদাসের কাছে গেলেন। অনেক জল বেরিয়েছিল। ট্রোকারের ক্যানুলাটা বার ক'রে নিয়ে বেন্‌জোইন্‌ দিয়ে সিল ক'রে দিলেন জায়গাটা।

সেই ছোকরা তিনজন এগিয়ে এল এবং ছিপলির উপর প্রায় হুমড়ি

খেয়ে প'ড়ে সদাশিবকে বাংলায় জিগ্যেস করতে লাগল—"শিলাই ক'রে দিলেন না কি—"

সদাশিব আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না।

"নিকল্ যাও হিয়াঁসে—"

"নিকল্ যায়েঙ্গে! হাটিয়ামে তো সব কোইকো equal right হ্যায়—"

সদাশিব জনতার দিকে চেয়ে বললেন —"নিকল্ দেও এই তিন ছোকরা কো—"

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে উঠল সবাই এবং 'মার' 'মার' শব্দে তেড়ে গেল তাদের। দেখতে দেখতে দাঙ্গা বেধে গেল একটা। প্রচণ্ড মার খেলে ছোকরা তিনটি। চুলের ঝুঁটি ধ'রে টানতে টানতে বার ক'রে দিল তাদের হাট থেকে। ধী-বিশাল পাণ্ডে একটু ভয় পেয়ে গেল। সদাশিবকে বললে, "ও তিনটেই হারামি ডাক্তারবাবু। ওদের ঘাঁটিয়ে ভাল করলেন না। আমার দোকানেই ব্যাপারটা ঘটল, হয়তো কোনদিন আমাকে এসে বে-ইজ্জত্ করবে। লুটও করতে পারে—"

"কোনও ভয় নেই। কি করবে ওরা। আমি এখনই থানায় ডায়েরি ক'রে দিচ্ছি। মঙ্গলদাস তুমি শুয়ে পড় এবার। কেমন লাগছে—"

"অনেক হাওলা লাগছে। বিরিঞ্চি ভাই, আউর থোড়া নাম শুনাও—"

"দাঙ্গার গোলমালে কীর্তন বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। আবার শুরু হ'য়ে গেল—"জে জে রাধা, জে জে কিষুণ।"

ধী-বিশাল পাণ্ডের 'ধী' কতটা বিশাল তা বলা শক্ত কিন্তু দেহটি যে বিশাল তাতে সন্দেহ নেই। বৃহৎ একটা ষাঁড়ের মতো চেহারা তার। সে নিজেই দোকানের বড় বড় চাল-ভরতি বোরাগুলোকে তুলে তুলে ভিতরের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। দুটো উদ্দেশ্য। প্রথম, এইখানে খাটিয়া বিছিয়ে মঙ্গলদাসের জন্য বিছানা ক'রে দেওয়া। দ্বিতীয়,

চালের বোরাগুলোকে ভিতরে সরিয়ে রাখা। কি জানি যদি ওই গুণ্ডার দল এসে পড়ে তাহলে সামনেই চালের বোরা পেলে নয়-ছয় ক'রে দেবে সব। চালের বোরাগুলি ভিতরের ঘরে পুরে তাতে তালা লাগিয়ে ধী-বিশাল একটা দড়ির খাটিয়া নিয়ে এল পিছন দিক থেকে। একটা ডগ্‌মগে রঙের শতরঞ্জি বিছালো তার উপর। তারপর বালিশ আনল একটি। বালিশটির বিশেষত্ব, খুব ছোট এবং টাইট্। মনে হয় দমবন্ধ করে' আছে, এমনি বুঝি ফেটে তুলো বেরিয়ে পড়বে।

"ডাক্তারবাবু, মঙ্গলদাসজী এখানে কতক্ষণ থাকবে—"

"আজ দিনভোর থাক। সন্ধ্যের পর আস্তে আস্তে বাড়ি চ'লে যাবে গাড়ি করে'।"

বিরিঞ্চি আর ধী-বিশাল মঙ্গলদাসকে ধরে' আস্তে আস্তে খাটিয়ায় শুইয়ে দিলে। মঙ্গলদাসের সঙ্গে বিরিঞ্চি বা ধী-বিশালের রক্তের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু যারা একথা জানে না, তাদের মনে হবে ওরাই এর পরমাত্মীয়।

সদাশিব নবীপুরের হাট থেকে সোজা থানায় চ'লে গেলেন। যাবার সময় ছিপলিকেও নিয়ে গেলেন সঙ্গে ক'রে।

চৌদ্দ

জিরাফ-প্রতিম সিংহেশ্বর সিং দারোগা সোচ্ছ্বাসে সম্বর্ধনা করলেন সদাশিবকে।

"আইয়ে আইয়ে ডাক্‌টার সাহেব, কেয়া সৌভাগ্য। পধারিয়ে। আপকা 'কিরপা'সে মুন্না তো একদম cured হো গয়া। আরে মুন্না, ডাক্‌টার সাহেবকো প্রণাম কর—"

একটি ফরসা কিশোর এসে লজ্জিতভাবে প্রণাম করল।

"ডাক্‌টার সাহেবকো কুছ্ ন্যাশ্‌তা (জলখাবার) লা দেও—"

সদাশিব বললেন, "না, আমি এখন কিছু খাব না—"

"চায় ?"

"না। আমি যে জন্য এসেছি তা শুনুন।"

নবীপুর হাটের ঘটনা সব খুলে বললেন তাঁকে। তারপর বললেন, "ওই তিন ছোকরার বিরুদ্ধে ডায়েরিতে লিখে নিন। এই ছিপলি মেয়েটাকে ওরা হাটে জ্বালাতন করছিল, হাটের সবাই দেখেছে। ওকে যা জিগ্যেস করতে চান করুন—"

সিংহেশ্বর গম্ভীর হয়ে' গেলেন। তারপর হিন্দীতে যা বললেন তার মর্ম হচ্ছে, "ও ছোকরা তিনটে যে পাজি তা তো সুবিদিত। কিন্তু ওরা আটঘাট বেঁধে এমনভাবে বদমায়েশী করে যে ওদের ধরা-ছোঁয়া যায় না। আমরা যদি কিছু করতে যাই আমরাই বিপদে প'ড়ে যাব। কারণ যাদের অধীনে আমরা চাকরি করি, যাদের হুকুম অনুসারে আমাদের চলতে হয়, তারা ওদের স্বপক্ষে। তবে আপনি যখন বলছেন তখন আমি ডায়েরিতে লিখে নিচ্ছি। আপনি ব্যাপারটা এস. পি. এবং ডি. আই. জি-র কানেও তুলে দিন। ওঁরা বড় অফিসার, ওঁরা ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই করতে পারেন।" তারপর হেসে বললেন—"যা 'জমানা' (দিনকাল) পড়েছে তাতে ওঁরাও পারেন কি না সন্দেহ। চাকরির মায়া তো সকলেরই আছে।"

দারোগা সাহেব ছিপলিকে আপিস ঘরে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। তারপর যথারীতি ডায়েরিটা লিখে নিলেন।

...ছিপলিকে রাস্তায় নাবিয়ে দিয়ে সদাশিব গেলেন ডি. আই. জি-র কাছে। যেতে যেতে তাঁর মনে হ'তে লাগল তিনি ডাক্তার, ডাক্তারি ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছুতে মাথা-গলাতে যাওয়াটা কি তাঁর

উচিত হচ্ছে ? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেয়ে গেলেন নিজের মনের ভিতর থেকেই। বহুকাল আগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের একটা লেখা পড়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন যে কেমিস্ট হয়েও তিনি কেন দেশের কাজে নেমেছেন। সেই প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে বিখ্যাত ফরাসী রসায়নবিদ্ Henri Moissau-এর একমাত্র পুত্র Louis বিশ্বমহাযুদ্ধে যোগ দিয়ে মারা যান। তিনিও একজন রসায়নবিদ্ ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র Laski-র বিখ্যাত প্রবন্ধ—The Danger of Obedience থেকে কিছু উদ্ধৃত করেছিলেন। সেই কথাগুলো সদাশিবের মনে পড়ল। Men who insist that some particular injustice is not their responsibility sooner or later becomes unable to resent any injustice. Tyranny depends upon nothing so much as the lethargy of a people. Autocracy is born above all of the experience that it need not expect active resentment against injustice. This is the inner truth of Thoreau's famous sentence that 'under a government which imprisons any unjustly the true place for a just man is also a prision.'—

আরও খানিকটা কি ছিল কিন্তু সদাশিবের তা মনে পড়ল না। তবে তাঁর মনের সংশয় কেটে গেল। অন্যায় অসভ্য অসুন্দরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য। ডাক্তার হয়েছেন বলেই তিনি এ কর্তব্যের দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না। দেশ এখন স্বাধীন বলেই এ দায়িত্ব আরও প্রবল হয়েছে। বহুকালের পরাধীনতা আর অশিক্ষার ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষই স্বার্থপর পশুতে পরিণত হয়েছে, তাদের মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে অনেক সময়

লাগবে। বর্তমান সমাজের ও শাসনব্যবস্থার ভয়াবহ চেহারা দেখে ভয় পেলে চলবে না, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এই সংগ্রামে সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা যদি প্রাণপণে লেগে না থাকেন তাহলেই ভয়ের কথা। এই সব ভাবতে ভাবতে সদাশিব ডি. আই. জি-র বাংলোয় পৌঁছলেন।

ডি. আই. জি. অফিসে কাজ করছিলেন। সেখানেই সদাশিবকে ডেকে পাঠালেন।

"নমস্কার। আসুন, আমিই আপনার ওখানে যাব ভাবছিলাম।"

"কেন বলুন তো ?"

"সিরোসিস্ অব্ লিভার সারে কি ?"

"সেটা নির্ভর করে লিভারটা কতটা খারাপ হয়েছে তার উপর। কেন, কার হয়েছে সিরোসিস্ অব্ লিভার—"

"আমার। পাপী লোক তো ! কতটা খারাপ হয়েছে তা কি পেট টিপে বুঝতে পারবেন ?"

"খানিকটা পারব। তবে ভাল ক'রে জানতে হ'লে কতকগুলো ল্যাবরেটরি টেস্ট্ আছে তা করতে হবে। তা এখানে হবে না, কোলকাতায় যেতে হবে—"

"তাই যাব। তবে, কোলকাতার ব্যাপার কি জানেন, কে ভালো ডাক্তার, কে রিলায়েবল্, কে নয় তা ঠিক করা বড় শক্ত। অনেক ডিগ্রিধারী জুয়াচোর ফাঁদ পেতে বসে আছে তো, প্রত্যেকের টাউটও ঘুরছে বাজারে। আপনি যদি কোন ভালো লোকের কাছে পাঠিয়ে দেন সেইখানেই যাব—"

"কি কষ্ট হয় আপনার ?"

"ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। অম্বলে বুক জ্বালা করে বিকেলের দিকে—"

"সেটা সিরোসিস্‌ অব্‌ লিভারের জন্য না-ও হ'তে পারে।"

"মদ খাই যে। গিল্‌টি কন্‌শেন্‌স তো। এখন যিনি সিভিল সার্জন আছেন তিনি ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন। ইন্‌জেক্‌শনও দিয়ে যাচ্ছেন রোজ একটা করে'। কিচ্ছু ফল হচ্ছে না। তাই ভাবছিলাম আপনাকে একবার কন্‌সাল্‌ট করব।"

"মদ খেলে যে সিরোসিস্‌ হবেই এমন কোনও কথা নেই। হিন্দু বিধবাদেরও সিরোসিস্‌ হ'তে দেখেছি। তারা মদ খায় না, ঝাল খায়, আর প্রোটিন্‌ নামমাত্র খায়। অনেকের মতে প্রোটিন ফুডের অভাবই সিরোসিসের একটা কারণ।"

"আমি তো রোজ ছুটো করে' মুরগি খাই।"

"আপনি এক কাজ করুন, খাবার পর ফোঁটা কয়েক অ্যাসিড্‌ খেয়ে দেখুন না, আপনার কষ্ট কমে কি না।"

"বেশ লিখে দিন প্রেস্কৃপশন্‌ একটা।"

কাগজ আর কলম এগিয়ে দিলেন। প্রেস্কৃপশন্‌টা লিখে বললেন, "আমার মোটরেই ওষুধ আছে। বলেন তো দিয়ে দি।"

"দিন—"

সদাশিব বেরিয়ে গেলেন এবং একটু পরেই ফিরে এলেন একটা ছোট শিশি আর একটা ড্রপার নিয়ে।

"এটা অ্যাসিড্‌ হাইড্রোক্লোরিক ডিল। এর দশ ফোঁটা খাবেন একটু জলের সঙ্গে মিশিয়ে, খাবার পরই ছু'বেলা। আউন্সখানেক জল দেবেন, বেশ টক।"

"থ্যাঙ্কিয়ু। এর দাম টাম—"

"দাম অতি সামান্য, তা আর দিতে হবে না। তবে আমি একটা কাজের জন্যে এসেছি, যদি একটু সাহায্য করেন উপকৃত হব।"

"কি বলুন। আপনার সে লোকটা তো ছাড়া পেয়ে গেছে নিশ্চয়ই—"

"হ্যাঁ। এ একটা অন্য ব্যাপার—"

সব বললেন খুলে।

ডি. আই. জি. একটু চুপ করে' থেকে বললেন, "থানায় ডায়েরি করিয়ে ভালই করেছেন। আমি দেখব। ওই ছিপলির সঙ্গে আপনার আলাপ হ'ল কি করে'?"

"ওদের বাড়িতে আমি চিকিৎসা করি। ওরা ঘরের লোকের মতো হ'য়ে গেছে।"

"ও, আচ্ছা আমি দেখব।"

তারপর হেসে বললেন, "আপনি যদি আপত্তি না করেন একটা হুইস্কি-সোডা অর্ডার করি—"

"না, না আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। আপনার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না যে আপনার সিরোসিস হয়েছে।"

টং করে' ঘণ্টা টিপতেই এক আরদালী এল।

"হুইস্কি-সোডা—"

হুইস্কি-সোডায় এক চুমুক দিয়ে বললেন, "আপনার রিভলবার আছে?"

"আছে।"

"সঙ্গে থাকে তো?"

"না।"

"সঙ্গে রাখবেন। যে গুণ্ডা তিনটির নাম করলেন তারা সাংঘাতিক লোক। ওদের কথা আমি শুনেছি। ওদের গায়ে হাত দেওয়া শক্ত। ওদের খুঁটির জোর আছে। অবশ্য আমি কিছু কেয়ার করি না। আমার রিটায়ার করবার সময় হ'য়ে এসেছে, ওরা আমার বেশী কিছু করতে পারবে না। তবে আপনি একটু সাবধানে থাকবেন—"

"স্বাধীনতা হওয়ার পর থেকে ছেলেদের উচ্ছৃঙ্খলতাটা একটু বেড়েছে---"

"বাড়বেই তো। আমি তো ইংরেজ আমলের লোক, এদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। খদ্দর পরে' যারা স্বাধীনতা-আন্দোলনে নেবেছিল তাদের মধ্যে ওয়ান পারসেণ্ট লোক ভাল ছিল কি না সন্দেহ। তাদের হাতেই রাজত্ব গেছে, তারা লুটেপুটে খাচ্ছে। সেদিন এক গ্রামে এক বড় গৃহস্থের বাড়ি ডাকাতি হয়ে' গেছে, গ্রামের লোক তাড়া করাতে ডাকাতগুলো পালিয়েছিল। কিন্তু তারা যে জীপ্‌টায় এসেছিল সেটা নিয়ে যেতে পারে নি। দেখা গেল সে জীপ্‌টা একজন হোমরাচোমরা রাজপুরুষের—"

"কি করলেন আপনারা?"

"কি আর করব। তিনি বললেন, তাঁর জীপ্‌টাও ডাকাতরা চুরি করে' নিয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা ধামা-চাপা পড়ে' গেল। দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না, আর সে দুরাত্মার পিছনে যদি রাজবল থাকে তাহলে সে দিনে দুপুরে হাতে মাথা কাটবে—"

"এর প্রতিকার কি?"

"প্রতিকার? It will come in time! ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের ইতিহাস পড়েছেন?"

"ভাল করে' পড়ি নি।"

"পড়ে দেখবেন। ওর মধ্যে অনেক শিক্ষাপ্রদ জিনিস আছে।"

ডি. আই. জি. হাসিমুখে হুইস্কি-সোডা সিপ করতে লাগলেন।

"আচ্ছা এবার উঠি আমি।"

"আচ্ছা। নমস্কার। দিন আষ্টেক পরে খবর পাঠাব কেমন আছি। নমস্কার।"

পনর

সদাশিবের মোটর বাজারের কাছে দাঁড়িয়েছিল।

বাজারে তিনি রোজ একবার করে' যান, শুধু বাজার করবার জন্যেই নয়, বাজারের লোকদের খবর নেবার জন্যও বটে। মাঝে কয়েকদিন যেতে পারেন নি। সেদিন গিয়ে আবদুলকে দেখতে পেলেন না। শুনলেন তার জ্বর হয়েছে। তার জায়গায় জগদম্বা বসে' মাছ বিক্রি করছে।

জগদম্বা মাছের ব্যবসা ছেড়ে চায়ের দোকান করেছিল, তার দোকানে বড় বড় কাচের বোতলে রঙীন মাছ ছিল, সিনেমা-অভিনেত্রীদের ছবিও টাঙানো ছিল অনেকগুলো। চা বিক্রিও হ'ত খুব। হঠাৎ সে আবার মাছ বিক্রি করতে বসল কেন? জগদম্বা বললে লোকে ধারে চা আর পান খেয়ে খেয়ে দোকানটা তার উঠিয়ে দিলে। সে কাকে 'না' বলবে? বাবুভেইয়ারা পর্যন্ত ধারে নিতে আরম্ভ করেছিল। তার পুঁজি আর কতটুকু! সুতরাং দোকান তুলে দিতে হয়েছে। এখন সে আড়তদারের মাছ বিক্রি করে। যা লাভ হয় ভাগাভাগি করে' নেয়।

ছিপলি তার কোণটিতে ঠিক বসেছিল। তাঁকে দেখে মৃদু হেসে বললে যে তাঁর জন্যে সে সদ্য-ধরা টাটকা রুই মাছের পেটি খানিকটা রেখে দিয়েছে। আরও একটিও সুখবর দিলে সে। সেই গুণ্ডা ছোঁড়া তিনটেকে পুলিসে ধরে' নিয়ে গিয়ে চালান দিয়েছে। তার কাছে ভগলু মহলদার বসেছিল প্রকাণ্ড একটা চিতল মাছ নিয়ে। সদাশিব দেখলেন তার একটা চোখ বেশ ফুলে রয়েছে।

"চোখে কি হ'ল ভগলু?"

ভগলু মৃদু হেসে চুপ করে' রইল, তার ঝাঁকড়া গোঁফগুলো কম্পিত হ'তে লাগল শুধু।

"কি হ'ল চোখে—"

চিতল মাছটাকে দেখিয়ে বললে—"ই শালা মারিস হ্যয়।"

চিতল মাছের ল্যাজের ঝাপটায় চোখটা জখম হয়েছে তার। সদাশিব চোখটা দেখলেন। তারপর বললেন, "বিশেষ কিছু হয় নি, সেক দিও। আর আমি ওষুধ এককোঁটা দিয়ে দেব চোখে।"

বাঁড়ুয্যে মশাই যথারীতি মাছ ঘাঁটছিলেন বসে'।

"নমস্কার বাঁড়ুয্যে মশাই। ভাল আছেন? ক'দিন আসতে পারি নি।"

বাঁড়ুয্যে ঘাড় তুললেন না। হেঁটমুণ্ডেই উত্তর দিলেন। "নমস্কার। আপনি আমার ওখানে খাবেন বলেছিলেন, কই তো এলেন না!"

"নানা কাজে ব্যস্ত থাকি। ভুলেই গেছি।"

"তা বুঝতে পেরেছি। গরীবের কথা ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক।"

অপ্রতিভ হ'য়ে পড়লেন সদাশিব।

"আচ্ছা, আজই খাব। বারোটা নাগাদ যাব আপনার বাসায়।"

"বেশ—"

হঠাৎ সরখেলের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হ'য়ে গেল। তাঁর বাঁ হাতে রুমালে বাঁধা কতকগুলি কুঁচো মাছ। চোখেমুখে একটা চাপা অপ্রসন্নতা ফুটে রয়েছে। দারিদ্র্য-জনিত যে অসন্তোষের আগুন তাঁর অন্তরে ধিকিধিকি অহরহ জ্বলে তার শিখা তাঁর চোখেমুখে পরিস্ফুট। সৌভাগ্যবান লোকের সান্নিধ্য তিনি সহ্য করতে পারেন না। সদাশিবকে পারতপক্ষে তিনি এড়িয়ে চলেন। বাজারের সেরা মাছ মাংস তাঁর বাড়িতে রোজ যায় এইটেই বরদাস্ত করতে পারেন না তিনি। সদাশিবকে দেখলেই তাঁর চোখেমুখে একটা উগ্রভাব দেখা দেয়। ভদ্রতার খাতিরে একটু হাসেন অবশ্য, কিন্তু তা ঈর্ষ্যা-ক্লিষ্ট তিক্ত হাসি।

"নমস্কার। আপনার জন্যে তো রুই মাছের পেটি কেটে রেখেছে মেছুনীটা। আমিও নিতুম, কিন্তু একটু দোরসা মনে হ'ল, তাই আর নিলাম না। খুব 'রেয়ার' জিনিস পেয়ে গেছি একটা—"

"কি—"

"টাট্‌কা ট্যাংরা মাছ। এ দেশে দুর্লভ—"

"তা বটে—"

নমস্কার ক'রে সরখেল কেটে পড়লেন।

তারপর দেখা হ'ল প্রফেসার জলধরবাবুর সঙ্গে। থলথলে মোটা মানুষ। বাজারে কখনও আসেন না। ভিড়ে আর ঠেলাঠেলিতে বিব্রত হ'য়ে পড়েছেন।

"নমস্কার, নমস্কার, আপনি হঠাৎ বাজারে যে!"

"আর বলেন কেন। জামাই এসেছে। গিন্নী বললেন তুমি নিজে গিয়ে রুই মাছের মুড়ো নিয়ে এস একটা। কিন্তু রুই মাছই তো নেই। সবই দেখছি আড়, শিলং আর বাঘাড়। এই ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি করে' খোঁজাও তো মুশকিল—"

"দাঁড়ান দেখছি—"

তিনি এগিয়ে গেলেন ছিপলির কাছে।

"তুই যে রুই মাছটা কেটেছিলি তার মুড়োটা কোথা?"

"তোরহ্‌ বাস্তে রাখলি—"

ছিপলি আলাদা ক'রে রেখে দিয়েছিল মাছ আর মুড়ো পিছনের দিকে একটা ঝুড়িতে ন্যাকড়া চাপা দিয়ে।

"মুড়োটা প্রফেসার সাহেবকে দিয়ে দে। জলধরবাবু, মুড়ো পাওয়া গেছে একটা—"

জলধরবাবু আকর্ণ হাসি হেসে বললেন—"বাঁচালেন মশাই। মুড়ো না নিয়ে গেলে জামাইয়ের কাছে মান থাকত না। এর দাম—"

ছিপলি দাম নিতে চাইছিল না। সদাশিব ধমক দেওয়াতে নিলে। জলধরবাবু একটু অবাক হলেন—"দাম নিতে চাইছে না কেন!" "ও আমার বেটি কিনা। তাই আপনাকেও খাতির করছিল।" অনেক ধন্যবাদ দিয়ে জলধরবাবু চলে' গেলেন.

সদাশিব চারদিকে একবার চেয়ে দেখলেন। পরিচিত সবাইকেই দেখতে পেলেন। বাজারে এসে নিজের অজ্ঞাতসারেই অনেকে স্বরূপ প্রকাশ করে' ফেলেন। পবিত্রবাবু মাছের বাজারে ঘোরেন যেন তিনি নিজের জমিদারি পরিদর্শন করছেন। স্কুলমাস্টার শম্ভুবাবু সর্বদাই কুণ্ঠিত, ভিড়ের মধ্যে সাইকেল ঠেলে ঠেলে ঢোকেন, দেখা হলেই ঘাড়টি নুইয়ে নমস্কার করেন। তাঁর সাইকেলটি একটি জবড়জং ব্যাপার। সামনে-পিছনে বেতের ঝুড়ি নানারকম জিনিসে ভরা। তরি-তরকারি, ওষুধ, কাপড়।

শম্ভুবাবু ভোর সকালে টিউশনি করতে বেরোন। দুটো টিউশনি সেরে এসে বাজার করেন। তারপর বাড়ি গিয়ে স্নানাহার করেই স্কুলে ছোটেন। স্কুল থেকে আর বাড়ি ফেরেন না, টিউশনি করতে যান। রাত দশটা পর্যন্ত টিউশনি করেন। ঘানির বলদরাও বোধ হয় এত খাটে না। অথচ তাঁর মুখে কোন অসন্তোষ বা ক্ষোভের গ্লানি নেই। মিষ্টি হাসিটি লেগেই আছে।

ত্রৈলোক্যবাবুর স্বভাব কলহ করা। তিনি মাছ কিনবেন এক পো কি দেড়পো কিন্তু তাঁর বায়নাক্কা অনেক। ওজনদাঁড়ির 'পাষাণ' দেখবেন, মাছ টাটকা কি বাসি দেখবেন, মাছের সঙ্গে 'কানকো' বা ফুলখারা দিচ্ছে কিনা দেখবেন, পরিশেষে দর নিয়ে কচলাকচলি করবেন। তাঁর মুখটা নাক-সর্বস্ব। খাঁড়ার মতো নাক। টকটকে ফরসা রং, কটা চোখ। মনে হয় কোন সাহেব যেন বাঙালী পোশাক পরেছে। জেলেরা তাঁর নাম দিয়েছে সাহেববাবু। তিনি মাছ

কেনবার সময় এত হাঙ্গামা করেন, কিন্তু জেলেরা এতটুকু বিরক্ত হয় না। তাঁর এই সব অন্যায় আব্দার হাসিমুখে সহ্য করে তারা।

কতরকম লোকই যে আসে বাজারে। একদল আসে তাদের ব্যক্তিত্ব বলে' কিছু নেই। মুখের দর্পণে কোন ভাব প্রতিফলিত হয় না। বোদা চেহারা। ভিড়ের মধ্যেও যেমন, ফাঁকা জায়গাতেও তেমনি। কথা বলে না, গা বাঁচিয়ে চলে, টুক করে' বাজারে ঢোকে, টুক করে' বেরিয়ে যায়। অনেকটা শশক-প্রকৃতির।

হঠাৎ যোগেনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি একজন খবরের কাগজের ঘুণ। দু'তিনটি কাগজ তন্ন তন্ন করে' পড়েন এবং কারো সঙ্গে দেখা হলেই খবরের কাগজের খবর নিয়েই আলোচনা করেন।

"ডাক্তারবাবু নমস্কার। নেহেরুর কাণ্ডটা দেখেছেন? আমাদের অতখানি জায়গা পাকিস্তানকে দিয়ে দিলে! যেন ওর বাপের সম্পত্তি। ও যদি আর কিছু দিন প্রাইম মিনিস্টার থাকে আমাদের প্রত্যেকের ভিটেতে ঘুঘু চরিয়ে দেবে—"

সদাশিব সাধারণতঃ রাজনৈতিক তর্ক করেন না। মুচকি হাসলেন একটু। উত্তেজিত যোগেনবাবু বললেন, "আপনি কেন যে খদ্দর পরেন বুঝি না। ওই খদ্দরধারীরাই তো আমাদের দফা নিকেশ করে' দিলে বাঙালীদের নিশ্চিহ্ন করে' দেবে ওরা, দেখে নেবেন। দেখবেন ঠিক দেবে। গরীবের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি হয়।"

যোগেনবাবুর ক্ষোভের কারণ আছে। তিনি রিটায়ার করবার পর এক্স্‌টেনশন্ পান নি। তাঁর ধারণা বাঙালী বলেই পান নি। তাঁর ছেলে থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক, একবার ফেল করে' আই. এ., দু'বার ফেল করে বি. এ. পাস করেছে। কোথাও তাকে ঢোকাতে পাচ্ছেন না। তাঁর ধারণা বাঙালী বলেই পাচ্ছেন না। আহা, আজ

যদি হ্যামিলটন সাহেব থাকত তাহলে তাঁর ছেলের চাকরির ভাবনা! সেলাম করলেই চাকরি হ'ত। বারবার এই কথাই বলেন।

যোগেনবাবু একটি সাংঘাতিক খবর দিলেন।

"মহেন্দ্রবাবুর খাবার আপনার বাড়ি থেকে যায় তো?"

"হ্যাঁ—"

"তাঁর খবর জানেন?"

"না। অনেকদিন দেখা হয় নি।"

"শুষ্ছে—"

"তাই না কি?"

"যান একবার দেখে আসুন।"

"শুষ্ছে? আমাকে তো কোন খবর দেন নি।"

"খবর দিলে যদি খাওয়াটি বন্ধ করে' দেন, সেই ভয়ে দেন নি। রোজ রসগোল্লা কিনে খেতেন। আপনি নাকি খেতে বলেছিলেন?"

"না। আমি তো মিষ্টি খেতে বারণই করেছিলুম।"

"উনি এখন দোষটা আপনার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। ওঁর খাওয়ার খরচটা তো আপনার ঘাড় দিয়ে চলে' যেত, যা বাড়তি পয়সা হাতে থাকত তাই দিয়ে রসগোল্লা কিনতেন।"

…সদাশিব গিয়ে দেখলেন মহেন্দ্রবাবু সত্যিই মরছেন। শেষ অবস্থা। আচ্ছন্নের মতো পড়ে' আছেন। অনেক ঠেলাঠেলির পর চোখ খুললেন।

"কে ডাক্তারবাবু! নমস্কার—"

খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে আবার বললেন, "অনেক করলেন আমার জন্যে। অনেক ধন্যবাদ। আপনার কথা একটাও শুনি নি। বাঁচতে চাই না। বেঁচে সুখ নেই—"

একটু পরেই মারা গেলেন।

শবদাহের ব্যবস্থা করে' বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের বাড়িতে আসতে প্রায় একটা বেজে গেল। বাঁড়ুয্যে মশাইদের বাড়ি বেশ বড়। কিন্তু পরিবার বড় বলে' ভাগ ভাগ হয়ে' গেছে। বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের ভাগে দু'খানি ঘর, একফালি বারান্দা, একফালি উঠোন, আর উঠোনের পাশে ছোট রান্নাঘর। বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের নাতনীটি ছাড়া আর কেউ নেই। নাতনীটির চেহারা বীভৎস। মুখের আধখানা পোড়া। স্টোভে পুড়ে গিয়েছিল। সদাশিব গিয়ে দেখলেন বাঁড়ুয্যে মশাই নিজেই রাঁধছেন। শুধু গা, পরনে একটি গামছা। রান্নাঘর থেকে তিনি বললেন, "ওরে, ডাক্তারবাবুকে ঘরে বসিয়ে হাওয়া কর। একটু বসুন। বেগুন-চিংড়িটা নাতনীকে দিয়ে রাঁধিয়েছি, ওটা ওর স্পেশালিটি। আমি লাউঘণ্টটা রাঁধছি, ওটা আমার স্পেশালিটি। খেয়ে দেখুন কেমন লাগে—"

সদাশিব ঘরের ভিতরে গিয়ে বসলেন। নাতনী একটি ভাঙা হাত-পাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগল। ঘরের চারদিকেই দারিদ্র্যের ছাপ। দেওয়ালে বহুকাল চুনকাম করা হয় নি। দু' এক জায়গায় নোনা ধরেছে। চেয়ারটা ভাঙা, নড়বড়ে, একটা হাতল নেই। বিছানার চাদর ময়লা। মাছি ভন ভন করছে চতুর্দিকে। পাশের নর্দমা থেকে দুর্গন্ধ উঠছে একটা।

সদাশিব কখনও বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের বাড়িতে আসেন নি। যখন হাসপাতালে সিভিল সার্জন ছিলেন তখন এই নাতনী স্টোভ জ্বালতে গিয়ে পুড়ে যায়। বাঁড়ুয্যে মশাই হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন একে। বাঁচবার আশা ছিল না। অনেক চেষ্টা করবার পর বাঁচল বটে, কিন্তু মুখটা বীভৎস হ'য়ে রইল।

সদাশিবের কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। তিনি যেন হঠাৎ একটা রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন। নিম্নমধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙালী গৃহস্থের

নগ্নরূপটা তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল এদের দশা কি হবে? এরা কি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে? কে বাঁচাবে এদের? ভারত স্বাধীন হয়ে' এরাই তো সবচেয়ে বেশী বিপন্ন হয়েছে। উদ্বাস্তুদের কথা মনে পড়ল, তারা নাকি আরও বিপন্ন। শিয়ালদহ স্টেশনে তাদের যে চেহারা একবার দেখেছেন তা মর্মন্তুদ। মানুষ নয়, যেন পশুর দল। তিন চারজন নেতা মিলে দেশটাকে ভাগ ক'রে দিলে ক্ষমতার লোভে! ভাঙা দেশ আবার কি জুড়বে? কতদিনে?

এই সব নানা চিন্তায় অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লেন তিনি। বাঁড়ুয্যে মশাই এলেন একটু পরে।

"হ'য়ে গেল, এইবার খেতে বসুন। মুখপুড়ী জায়গা ক'রে দে। কার্পেটের আসনটা বিছিয়ে দিস—"

নাতনী বেরিয়ে গেল। বাঁড়ুয্যে মশাই আবার চেঁচিয়ে বললেন, "কাঁসার গেলাসটা মেজেছিস তো?"

"হ্যাঁ"—মৃদুস্বরে উত্তর এল বাইরে থেকে।

বাঁড়ুয্যে মশাই (তখনও গামছা-পরা) ঈষৎ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর তাঁর ভাবলেশহীন মুখে হাসির ছটা ছড়িয়ে পড়ল একটু।

বললেন, "ওর মা ওর নাম স্বর্ণলতা রেখেছিল। দেখতে স্বর্ণলতার মতো না হোক তাম্রলতার মতো হয়েছিল। এখন ওকে মুখপুড়ী ব'লে ডাকি। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় ভাগ্যে ওর মুখ পুড়েছিল, তাই তো ও আমার কাছে আছে, আমাকে দুটো ভাত ফুটিয়ে দিচ্ছে। মুখ না পুড়লে তো এতদিন বিয়ে হ'য়ে আমাকে ছেড়ে চলে' যেত। বিয়ে দিতেই হ'ত, ভদ্রাসনটুকু বিক্রি করেও দিতে হ'ত। কিন্তু তা আর হ'ল না, ভগবান আমার উপর দয়া করলেন, মুখটা ওর পুড়ে গেল—"

ভগবানের এই দয়ার জন্যে বাঁড়ুয্যে মশাই যে কৃতজ্ঞ তা কিন্তু মনে হ'ল না। কারণ তাঁর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

সদাশিব বললেন, "আমার একটু সংকোচ হচ্ছে। এমনভাবে চড়াও হ'য়ে আপনাদের বাড়িতে খেতে এসে হয়তো আপনাদের বিব্রত করলুম—"

"কিছুমাত্র না। এ তো ভাগ্য, ভাগ্য, পরম ভাগ্য। বেশীদিনের কথা নয়, আমার ঠাকুরদার আমলেই আমাদের বাড়িতে দু'বেলায় পঞ্চাশজন লোকের পাতা পড়ত—পাড়ার লোক, বাইরের লোক, অতিথি বন্ধু আত্মীয় অনাত্মীয় কেউ বাদ পড়ত না। আমাদের ঠাকুমারা রূপোর গয়না পরতেন, শাড়ির বাহার ছিল না, কিন্তু তাঁরা দশজনকে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াতেন, নিজেরাই পরিবেশনও করতেন। দাসী চাকরানার মতো গজগজ ক'রে করতেন না, হাসিমুখে করতেন। দেখতে দেখতে সব মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল। এক জীবনে কতই না দেখলুম। চলুন—"

সদাশিব গিয়ে দেখলেন প্রচুর আয়োজন করেছেন বাঁড়ুয্যে মশাই। নানারকম তরকারি, নিরামিষই প্রায় আট দশ রকম।

"করেছেন কি! এতো কি খেতে পারব?"

"আপনি পারবেন না তো পারবে কে। আপনি তো খাইয়ে লোক—"

"আপনি খাবেন না?"

"আমার দেরি আছে। স্নান করব, আহ্নিক করব, তবে খাব। ভাবছি একেবারে ওবেলাই খাব। একবেলাই খাই আমি। দুবেলা খাওয়া সহ্য হয় না। আপনি ব'সে খান, আমি হাওয়া করি—"

"না, না আপনি হাওয়া করবেন কি—"

"যা মাছি, খেতে দেবে না আপনাকে। ফিনাইল কিনেও কূল পাই না, তাই আজকাল কেনা ছেড়ে দিয়েছি—"

খেতে খেতে গল্প হ'তে লাগল।

সদাশিব জিগ্যেস করলেন, "আপনাদের পরিবার এককালে নিশ্চয় খুব বড় ছিল—"

"বড় ব'লে বড়, রাবণের গুষ্টি। বিষয় ভাগ করতে করতে প্রত্যেকের ভাগে চটকস্য মাংসও হয় নি। এ পাড়াটাই বলতে গেলে আমাদের। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে মকদ্দমা করছে—ভেঙে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেল।"

"মকদ্দমা কেন—"

"মতিচ্ছন্ন আর কি! আমি নিজেই সাতবার মকদ্দমা করেছি। যা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল ওতেই গেছে। এখন পেন্সনটির উপর ভরসা। বেগুনচিংড়ি কেমন হয়েছে বলুন?"

"খাসা—"

"মুখপুড়ী ওটা রাঁধে ভাল "

"আপনার লাউঘণ্টও চমৎকার হয়েছে। এমন ঘণ্ট বহুকাল খাই নি। আপনি এতো চমৎকার রাঁধেন! বাঃ—"

"ও রান্নাটি আমার স্ত্রীর কাছে শিখেছিলাম। তিনি শিখেছিলেন তাঁর মায়ের কাছ থেকে। ওর একটু ট্রিকস্ আছে, সেটা সবাইকে শেখাই না।"

বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের মুখে আবার একটু হাসির ছটা ছড়িয়ে পড়ল।

"এতো রকম করেছেন, আবার মাংস করতে গেলেন কেন?"

"আপনি যে রোজ মাংস খান। আমি সব খবর রাখি—"

খাওয়া শেষ ক'রে সদাশিব যখন বিদায় নিচ্ছেন তখন বাঁড়ুয্যে

মশাই হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ক'রে বসলেন। ঝুঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন সদাশিবকে!

"আপনি যে গরীবের বাড়ি পাত পেড়ে দুটো খেয়ে গেলেন, এতে কৃতার্থ হ'য়ে গেলাম আমি—"

টপ্ ক'রে একফোঁটা চোখের জল পড়ল সদাশিবের পায়ের উপর। তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিলেন তিনি। বাঁড়ুয্যে মশাই ঘাড় ফিরিয়ে ভিতরের দিকে চ'লে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সদাশিব। তারপর গিয়ে মোটরে উঠলেন।

ষোল

খুব সকালে গীতিয়া এসেছিল। আর তার সঙ্গে এসেছিল একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে।

"এরা সব কে—"

"আমাদের পাড়ার ছেলেমেয়ে। সব চোখ উঠেছে। আপনি তো আমাদের পাড়ায় অনেকদিন যান নি, তাই ডেকে নিয়ে এলাম। নিজেদেরই তো গরজ।"

গীতিয়ার কণ্ঠস্বরে একটু অভিমানের সুর। সে যে ডাক্তারবাবুর বিশেষ স্নেহাস্পদা এ কথা সে পাঁচজনের কাছে খুব বড় গলা করে' ব'লে বেড়ায়, ডাক্তারবাবু অত টাকা দিয়ে তাদের মহাজনের কবল-মুক্ত করেছেন, কিন্তু সদাশিবের উদাসীন ব্যবহারে সে যেন একটু নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়েছে ইদানীং। সদাশিব যদি তাকে স্নেহের চক্ষে দেখতেন তাহলে এক মাসের মধ্যে একবারও কি খবর নিতেন না? আজবলাল চ'লে যাওয়ার পর সে সেখানে এসে থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু উনি

রাজী হন নি। সদাশিবের একটু স্নেহ পেলে সে কৃতার্থ হ'য়ে যায়। এর মধ্যে কোনও খারাপ ভাব নেই, খারাপ ভাব যে থাকতে পারে, তা তার চিন্তারও অতীত। সে সদাশিবের কাছে কন্যা-স্নেহ প্রত্যাশা করে। সদাশিব হয়তো তাকে স্নেহও করেন, কিন্তু তার কোন বহিঃপ্রকাশ নেই। গীতিয়ার তাই অভিমান হয়েছে একটু।

সদাশিব ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকের চোখে ওষুধ দিয়ে দিলেন। একটা শিশি ক'রে কিছু ওষুধ আর একটা ড্রপারও দিলেন।

"রোজ সকাল-বিকেল দিয়ে দিস—"

গীতিয়া তখন আঁচল থেকে খুলে খানকয়েক নোট সদাশিবের হাতে দিয়ে বললে—"এইটে রাখুন—"

"কি এটা—"

"দুজনে খেটে কিছু টাকা জমিয়েছি, ধারে সেটা শোধ ক'রে নিন—"

"ঘুঁটে আর দুধ দিয়ে শোধ করবার কথা ছিল। নগদ টাকা কেন? কোথা পেলি নগদ টাকা? কারো কাছে ধার করেছিস নাকি?"

চুপ ক'রে রইল গীতিয়া। তারপর বলল—"টাকা যে অনেক। ঘুঁটে আর দুধ দিয়ে ও টাকা জন্মে শোধ হবে না।"

"তুই টাকা কোথা পেলি বল না—"

গীতিয়া কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বলল—"ছবিলাল মোড়লের বাড়ি 'গিল্লা নোক্‌রি'তে বাহাল হয়েছি। খাওয়া-পরা দেবে, তাছাড়া ২৫৲ টাকা মাইনে দেবে। ওঁকেও কংগ্রেস-আপিসে একটা চাকরি ক'রে দিয়েছে, মাইনে ৪৫৲ টাকা, পিওনের কাজ করতে হয়। এ মাসে পঞ্চাশ টাকা জমাতে পেরেছি সেটা দিয়ে গেলাম। ঘুঁটে আর দুধে টাকা তিরিশেক শোধ হবে—"

সদাশিব টাকাগুলি পকেটে রেখে দিলেন। তারপর বললেন, "ছবিলাল লোকটা পাজি শুনেছি—"

"খুব পাজি। কিন্তু কি করব, ভালো লোকে না রাখলে পাজি লোকের কাছেই যেতে হবে—"

গীতিয়ার চোখে এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল।

চুপ ক'রে রইলেন সদাশিব, কি আর বলবেন। সেই পুরাতন সত্যটাই উপলব্ধি করলেন, অসাধু লোকেদের হাতে ক্ষমতা এসেছে, সাধুদের এখন পরিত্রাণ নেই। ছলে বলে কৌশলে ওরাই এখন ভোগদখল করবে।

প্রশ্ন করলেন, "ছবিলাল মোড়লের ছেলেটাকে তো পুলিশে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল—"

"ছাড়া পেয়ে গেছে। ওদের টাকার জোর আছে, কংগ্রেস ওদের সহায়, ওদের কি কেউ আটকে রাখতে পারে?"

স্তম্ভিত হয়ে' বসে' রইলেন সদাশিব। মনে হ'ল তিনি হেরে গেলেন। আর একটা কথাও মনে হ'ল—গীতিয়ার মতো মেয়ে এইবার ওই লম্পট ছেলেটার কবলে পড়বে। একটা ছবি ফুটে উঠল মনে—হরিণী যেন ময়াল সাপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

"আমি যাই তাহলে—"

গীতিয়া প্রণাম করে' কিছুদূর চ'লে গেল।

"গীতিয়া, শোন—"

"কি—"

"ও চাকরি ছেড়ে দে তুই—"

"সোৎসুক হ'য়ে উঠল গীতিয়ার চোখের দৃষ্টি। নির্বাক আগ্রহে সে চেয়ে রইল সদাশিবের দিকে। সদাশিব কোন কথা কইলেন না। তখন গীতিয়া জিগ্যেস করল—"চাকরি ছেড়ে দিলে আমাদের চলবে কি করে'?"

"তোরা স্বামী-স্ত্রী আমার এখানে এসেই থাক। তুই তো

লেখাপড়া জানিস, আমার বাড়ির 'আউট হাউসে' ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের স্কুল ক'র একটা। আর তোর স্বামী আমার গরু-বাছুর ঘর-দোর দেখাশোনা করুক। তুটো গাই এবার বিয়োবে। তু'জনে আমার এখানেই খাবি-দাবি থাকবি। তোদের আর যা যা দরকার হয় তা-ও পাবি।"

গীতিয়া হাতে যেন স্বর্গ পেল।

উদ্ভাসিত মুখে বলল—"এই তো আমি চাইছিলুম। যাই ওঁকে বলে আসি—"

"এগুলো নিয়ে যা—"

"কি—"

"টাকাগুলো—"

"ও নিয়ে আমি কি করব?"

"পোস্টাফিসে একটা পাস বুক ক'রে জমা ক'রে রাখ—"

"কিন্তু—"

"আর 'কিন্তু' শুনতে চাই না। যত শিগ্‌গির পার এখানে এসে পড়—"

গীতিয়া একছুটে বেরিয়ে গেল। ছেলেমেয়েগুলোও ছুটতে লাগল তার পিছু-পিছু।

রামলক্ষ্মণ ঠাকুর এসে বলল, চাল ডাল নুন তেল সব ফুরিয়ে গেছে। সদাশিব বললেন, আচ্ছা স্লিপ লিখে দিচ্ছি. দোকান থেকে আনিয়ে নাও। সদাশিব আজকাল বাইরে বাইরে খান। কিন্তু বাড়িতে অনেক লোক খায়, অনেক গরীবতুঃখী।

সতর

নবীপুরের হাটে দেখা হ'ল কেব্‌লি আর কেব্‌লির স্বামী নারানের সঙ্গে। কেব্‌লি একটি নূতন শাড়ি হলুদ রঙে ছুপিয়ে পরেছে, নারানের পরনেও একটি গোলাপী রঙের ধুতি। নারান এগিয়ে এসে প্রণাম করল সদাশিবকে। কেব্‌লি তার পিছনে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

"কি নারান, কি খবর, হঠাৎ প্রণামের ধুম কেন?"

"সাধি ভে গেলে হুজুর—"

কেব্‌লি মুখে কাপড় দিয়ে খুব হাসতে লাগল। নারানের দ্বিতীয়পক্ষে বিয়ে হওয়াতে সে যে খুব দুঃখিত হয়েছে তা মনে হ'ল না।

ধী-বিশালের দোকানের দিকে গেলেন সদাশিব। মঙ্গলদাসের খবর নিলেন। মঙ্গলদাস ভাল আছে। কিন্তু আবার জল জমেছে পেটে।

"ও তো জমবেই। ও অসুখ সারবে না। বেশী জল জমলে আবার বার ক'রে দিতে হবে। এই ভাবে যে ক'দিন চলে।"

ধী-বিশাল বললে মঙ্গলদাসও সে কথা বুঝেছে। তার বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা নাম-সংকীর্তন হচ্ছে। তারপর ধী-বিশাল নিম্নকণ্ঠে বললে যে, সেই 'বদমাশ' ছোকরা তিনটে পুলিসের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছে। কাল সন্ধ্যের সময় তার দোকানের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ধী-বিশাল ভয় খেয়ে তিনজন তীরন্দাজ সাঁওতাল বাহাল করেছে দোকান পাহারা দেবার জন্যে।

"তুমি থানাতেও একটা ডায়েরি করিয়ে দাও—"

"আচ্ছা—"

হাটে অনেক রোগী অপেক্ষা করছিল মোটরের আশে-পাশে। সদাশিব সেইদিকে গেলেন। ভিড়ের মধ্যে দেখলেন, কেব্‌লি দাঁড়িয়ে আছে, নারান সঙ্গে নেই।

ভিড় ক'মে যাবার পর কেব্‌লি কাছে এসে ফিসফিস করে' বললে দু নৌকোয় পা' দিয়ে নারান এখন মহাবিপদে পড়েছে। নারানের মা ওই কানী বিধবাকে ঘরে নিতে চাইছে না। আর ওই কানীর বাবা যে জমি দেবে বলেছিল সে জমিও দেয় নি। সে বলছে আগে দেখি আমার মেয়ের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে তবে জমি লিখে দেব।

"তোকে যে জমি দেবে বলেছিল তাও দেয়নি ?"

"না —"

"তুই কিছু বললি না ?"

"কানী হামরা মারে লে দৌগেছে। বড় বরিয়ার ছে। হাম্‌ ভাগীকে চললো আইলি। বড় মারখুণ্ডা ছে। ওকরো ভী মারেলা দৌগেছে—"

"কানী বিধবাকে বিয়ে ক'রে নারান তো তাহলে মহাবিপদে পড়েছে। কোথায় আছে এখন ও ?"

"হিয়াঁই। কাঁহা যাইতে—"

মুখ ফিরিয়ে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কেব্‌লি হাসতে লাগল। তারপর সে আসল কথাটি ভাঙলে।

আবার 'পঞ্চ' ডাকা হয়েছে। কেব্‌লির প্রাপ্য জমি তাকে দেওয়া হবে কিনা সেই 'পঞ্চ' ঠিক করবে। সেই পঞ্চের দু'জন মাতব্বর লোক সদাশিবকে খুব খাতির করে। তাদের কঠিন কঠিন অসুখে সদাশিবই নাকি একদিন সারিয়েছিলেন। তারা আবার ওষুধ নিতে সদাশিবের কাছে আসবে। তখন সদাশিব যদি তাদের একটু ব'লে দেন তাহলে কেব্‌লি জমিটা পেয়ে যাবে।

সদাশিব বললেন—"কবে কার অসুখ সারিয়েছি আমার তো কিছু মনে নেই !"

কেব্‌লি মনে করিয়ে দিলে তিনি তখন সরকারি কাজ করতেন। একজনের 'পোতা' (হাইড্রোসিল) আর একজনে 'গুরা' (ফোড়া) কেটেছিলেন। সদাশিবের মনে পড়ল না। বললেন, "আচ্ছা আমার কাছে আসে তো বলব। নারান আর একটা বিয়ে করেছে ব'লে তোর দুঃখ হয় নি একটুও -"

"দুখ করি কে কি করবো। ওই সেই ওকরো মতি-গতি আর হম্‌রা কপার—"

কেব্‌লি খানিকক্ষণ ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ল, তারপর চ'লে গেল।

তারপর এল কয়েকটা ছোট ছেলে। ফরসা জামা কাপড় পরা। সদাশিব তাদের চোখ দেখলেন, দাঁত দেখলেন, খুশী হলেন খুব।

"আলী এদের প্রত্যেককে দুটো ক'রে সন্দেশ দাও—"

আসবার সময় দীনু হালুয়াইদের দোকান থেকে সের দুই সন্দেশ কিনে এনেছিলেন তিনি। তারা সন্দেশ নিয়ে কলরব করতে করতে চ'লে গেল।

"আলী—"

"হজৌর - "

আলা সামনে এসে দাঁড়াল।

"তুমি সন্দেশ খেয়েছ ?"

আলীর মুখে সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে সে মৃদুকণ্ঠে বললে—"হুজুর হুকুম নেহি দেনে সে কৈসে খায়েঙ্গে ?"

খাও চারটে সন্দেশ। আজ আমাদের রান্নার ব্যবস্থা কি করেছ ? হাটে মাছ তেমন পেলে কি ?"

"নেই হুজুর ! মুরগি লেয়া দোঠো।"

"মুরগির ঝোল আর ভাত বানাও আজকে।"

"বহুত খু—"

বেশী মসলা দিও না। সাদা ঝোল বানাও—"

"বহুত খু—"

"কোথায় রাঁধবে আজ ? ওই বড় তালাওটার ধারে চল—"

"বহুত খু—"

আলী কয়েক মুহূর্ত ঘাড়টা একদিকে বেঁকিয়ে এবং ছুটি আঙুল তুলে দাঁড়িয়ে রইল, যেন সমস্ত ব্যাপারটা প্রণিধান ক'রে ফেলল। তারপর মোটরের পিছনে চ'লে গেল।

সদাশিব উঠতে যাবেন এমন সময় দেখতে পেলেন নারান আসছে। একা আসছে। সঙ্গে কেব্‌লি নেই।

"কি নারান, আবার এলে যে—"

নারান একটু চুপ ক'রে রইল, তারপর বলল—গোপনে সে তাঁকে একটা কথা বলতে চায়। এতক্ষণ সে হাটে অপেক্ষা করছিল। রোগীর ভিড় ক'মে যাবার পর এসেছে।

"কি কথা—"

নারান হিন্দীতে বললে—"আপনি কেব্‌লিকে একটু শাসন করে' দিন। ও একটা সিপাহীর সঙ্গে বড্ড বেশী মাখামাখি করছে। ভেবেছিলাম 'দোসরা' একটা 'সাধি' করে' আমি আলাদা সরে' থাকব, ও যা খুশী করুক। কিন্তু আমার মা ওই কানী বিধবাকে কিছুতেই ঘরে নিতে চাইছে না। আমাকে বাধ্য হয়ে' কেব্‌লির কাছে ফিরে আসতে হয়েছে। কিন্তু কেব্‌লি যদি একটা সিপাহীর সঙ্গে লট্‌পট্‌ করে তাহলে তো বরদাস্ত করতে পারি না। শেষকালে একটা খুনোখুনি কাণ্ড হয়ে' যাবে একদিন।"

সদাশিব প্রশ্ন করলেন,—"এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি? ও তোমাদের ঘরোয়া ব্যাপার তোমরাই ঠিক কর—"

হঠাৎ নারান সদাশিবের পা জড়িয়ে ধরল।

"আপ এক দফে কহ্‌ দেনে সে সব ঠিক হো যায়ে গা। উ আপকো বাপকা এইসা মানতা হ্যায়।"

হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগল নারান।

সদাশিব বললেন—"ওকে যদি চরিত্রহীন ব'লে মনে হয়, ছেড়ে দাও না ওকে—"

নারান বললে কেবৃলিকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না।

"আবার বিয়ে তো করতে গেছলে—"

নারান নিজেই নিজের দু'কান ম'লে গালে ঠাস ঠাস ক'রে চড়াতে লাগল।

"কসুর হো গিয়া হুজুর। কসুর হো গিয়া—"

সদাশিব বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। শেষে বললেন, "আচ্ছা, আমি শাসন ক'রে দেব। কিন্তু আমার কথা শুনবে কি?"

"জরুর শুনে গা, জরুর শুনে গা, উসকো বাপ শুনে গা—"

একটু পরেই রাস্তায় কেবৃলির সঙ্গে দেখা হ'ল। সে একাই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল হাট থেকে কিছু তরি-তরকারি কিনে। সদাশিব মোটর থামালেন। নাবলেন মোটর থেকে। কেবৃলিকে ডেকে নিয়ে গেলেন একটু দূরে।

"শুনৃছি তুই কোন্‌ এক সিপাহীর সঙ্গে লট্‌পট্‌ লাগিয়েছিস?"

কেবৃলি ঘাড় ফিরিয়ে একটু বেঁকে দাঁড়িয়ে রইল মুখে আধ-ঘোমটা টেনে।

সদাশিব সংক্ষেপে বললেন—"ফের যদি শুনি চাবকে তোর পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে ফেলব। মনে থাকে যেন; কথাটা মনে থাকবে তো?"

কেব্‌লি সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাৎ ক'রে জানাল, থাকবে।

সদাশিব ফের এসে মোটরে উঠলেন।

হঠাৎ একটা নির্মল আনন্দে তাঁর সমস্ত মন ভ'রে গেল যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি এদের যথার্থ আত্মীয় হ'তে পেরেছেন—এই উপলব্ধিতে তন্ময় হ'য়ে রইলেন অনেকক্ষণ।

আঠারো

কিন্তু হঠাৎ সব শেষ হ'য়ে গেল একদিন। গভীর রাত্রে সদাশিবের ঘুম ভেঙে গেল কুকুরের ডাকে। কুকুরটা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে খুব ডাকছিল। রামলক্ষ্মণ ঠাকুর, গীতিয়া, গীতিয়ার স্বামী সবাই উঠেছিল। সদাশিব উঠে আলোটা জ্বাললেন। রামলক্ষ্মণ এসে বলল যে ছিপলির স্বামী এসে ডাকাডাকি করছে। তাদের বাড়িতে নাকি ডাকাতি হচ্ছে। ডাকাতি হচ্ছে? ছিপলির স্বামীকে ডাকতে বললেন। সে এসে ভয়ে ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে লাগল। তারপর তাঁর পায়ের উপর আছড়ে প'ড়ে একটি কাতরোক্তিই সে করলে—"বাচাইয়ে হুজুর!" অনেক জেরার পর জানা গেল ছবিলালের ছেলেটি দলবল জুটিয়ে তাদের বাড়িতে হানা দিয়েছে, আর ছিপলির উপর বলাৎকার করছে। জিতু বাধা দিতে গিয়েছিল, পারে নি। সে তাই ছুটতে ছুটতে এখানে চলে এসেছে।

আলী সাধারণতঃ রাত্রে নিজের বাড়ি চলে' যায়। সদাশিব

নিজেই গাড়ি বের করে' বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে রইল রামলক্ষ্মণ ঠাকুর, গীতিয়ার স্বামী আর জিতু। রিভলভারটাও সঙ্গে নিলেন।

সদাশিব যখন পৌঁছলেন তখন যা হবার হয়ে' গেছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। টর্চ ফেলতে ফেলতে সদাশিব ঘরে ঢুকলেন। গিয়ে দেখলেন মেজের উপর বিস্রস্তবাসা ছিপলি পড়ে আছে। ঘরের কোণে আর একটা লোক দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে ছিল একটা লাঠি। সদাশিবকে দেখেই সে লাঠি চালাল। লাঠিটা সজোরে এসে লাগল সদাশিবের মাথায়। সদাশিব সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে' পড়ে' গেলেন।

উনিশ

সদাশিব অনুভব করলেন তিনি যেন কার কোলের উপর মাথা দিয়ে শুয়ে আছেন।

তিনি জিগ্যেস করলেন—"কে—"

"আমি ছিপলি—"

ছিপলিই তাঁর মাথাটা কোলে নিয়ে বসেছিল।

"এখনও কি রাত পোহায় নি ?"

গীতিয়া বললে—"অনেকক্ষণ সকাল হ'য়ে গেছে।"

"কই, আমি তো আলো দেখতে পাচ্ছি না—"

সদাশিবের চোখের ভিতর হেমারেজ হয়েছিল। তিনি অন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন।

শহর থেকে একজন ডাক্তার এসেছিলেন। তিনি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলেন।

সদাশিব যেতে চাইলেন না।

আস্তে আস্তে বললেন, "আমি এখান থেকে কোথাও যাব না।"

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল দেখতে দেখতে।

হাটের লোক, বাজারের লোক ভেঙে পড়ল ছিপলির বাড়িতে। বাঙালীরা কেউ যান নি। তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল অবশ্য। কেউ বললেন, লোকটা এক্‌সেন্ট্রিক, কেউ বললেন, বাহাদুরি করতে গিয়েই মৃত্যু হ'ল লোকটার, কারো মতে আসলে উনি চরিত্রহীন লোক ছিলেন, হাটে-বাজারে যুবতী মেয়েদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াতেন। এর নজীরস্বরূপ তিনি হ্যাভেলক এলিস, ফ্রয়েড থেকে বচন উদ্ধৃত করলেন। বাঁড়ুয্যে মশাইই নাকি কেবল বলেছিলেন—"উনি নর-রূপী দেবতা ছিলেন।" ডি· আই· জি ছিপলির বাড়ির চারিদিকে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করে' দিয়েছিলেন। আলী হাউ হাউ করে' কাঁদছিল কেবল। গীতিয়া, কেবৃলি, নারানও কাঁদছিল। সবারই চোখে জল।

আচ্ছন্নের মতো পড়ে ছিলেন সদাশিব। মাঝে মাঝে প্রলাপ বকছিলেন।

"কে আবদুল, জ্বর ছেড়েছে? এখন বাজারে যেও না, দু'দিন বিশ্রাম নাও—"

"ফালতু তোর কামিজটা তো ঠিক ফিট করে নি। রমজান দরজির কাছে যাস, সে মাপ নিয়ে নেবে একটা—"

"না, মঙ্গলদাস, নুনটা তুমি ছেড়েই দাও। নুন খাচ্ছ বলেই পা দুটো ফুলছে। নুন ছেড়ে দাও। দুধ ভাত খাও—"

"কে আবদুলের মা? নানি, তোর চোখ ঠিক ক'রে দিতে পারলাম না। আমিই অন্ধ হয়ে' গেলাম।

"নারান নাকি, কেবলি বলেছে, ভালভাবে থাকবে এবার।"

"ও কে? সরখেল মশাই, ইলিশ মাছ পেয়েছেন? বাঃ—"

"আজবলাল এসেছ? আজ ফিস্ট লাগাও একটা। সবাই খাক। ভাল মাছ মাংস পাঠিয়ে দিচ্ছি—"

"মহেন্দ্রবাবু না কি? সেরে গেছেন? রসগোল্লা খেয়ে সেরে গেলেন? এ তো বড় আশ্চর্য। রোগাও হ'য়ে গেছেন দেখছি। আমার মনে হয় কিন্তু রসগোল্লাটা বেশী না খাওয়াই ভালো—"

"মালতী? কেদার-বদরি ঘুরে এলি? বাঃ, কাশ্মীর কেমন লাগল? ভালো তো লাগবেই, ভুস্বর্গ ওর নাম। এইবার দাক্ষিণাত্যে বেড়িবে আয়। কন্যাকুমারী শুনেছি অপূর্ব—"

কে ভগলু মহলদার? সন্দেশ এনেছ? তোমার বেটির সাধি হ'য়ে গেল। বাঃ বাঃ। থাক আর প্রণাম করতে হবে না।"

"ছিপলি আমার রিভলভারটা তুই রেখে দে। তোর নামে লাইসেন্স করিয়ে দেব। ওটা সঙ্গে থাকলে কেউ আর কিছু বলতে পারবে না।"

"গীতিয়ার স্কুলটাকে আরও বড় করতে হবে। গীতিয়া পারবি তো? তুইও পড়, প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাস করে' ফেল—"

"মনু? ওই দেখ, তোমার জন্যে জরদা আনতে ভুলে গেলাম। তোমার কাশীর জর্দার কৌটোটা আলমারির মধ্যে আছে। ভেবেছিলাম নিয়ে আসব। সোহাগ বিলেতে চলে' গেছে, সেখানেই বাড়ি করেছে, সুখে আছে—"

ক্রমশঃ প্রলাপও বন্ধ হয়ে' গেল। ঠোঁট দুটো নড়ত খালি, কি
বলতেন কিছু বোঝা যেত না।

দিন দুই পরে তাঁর মৃত্যু হ'ল।

মালতী বা সোহাগকে খবর দিতে পারা যায় নি। ছিপলিই তাঁর
মুখাগ্নি করল।